POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 17

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

29 এপ্রিল, 2021 ● 16 রমযান 1442 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ
بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ
وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ (النساء:171)

হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয় এই রসূল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য সহ আগমণ করিয়াছে; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, ইহা তোমাদের কল্যাণজনক হইবে। কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় যাহা কিছু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রাহিয়াছে সবই আল্লাহ্‌র।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৫৩)

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১২৩৭) হযরত আবু যার (গাফফারী) রাজিআল্লাহু তা'লা আনহু-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: আমার প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন আগমণকারী আমার কাছে এসে আমাকে বলল।' তিনি বলেন- সে আমাকে সুসংবাদ দিল যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তির মৃত্যু এমন অবস্থায় হবে যে কি না আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে কাউকে শরিক করে না, সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১২৩৮) হযরত আব্দুল্লাহ্ (বিন মাসউদ) রাজিআল্লাহু আনহু-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরিক করা অবস্থা মৃত্যু বরণ করবে সে আগুনে প্রবেশ করবে আর আমি (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ) বলছি, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যে কি না আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে কাউকে শরিক করে না, এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১২৩৯) হযরত বারাআ (বিন আযিব) রাজিআল্লাহ্ আনহু-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) সাতটি বিষয় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন জানাযায় যেতে, অসুস্থদের খোঁজখবর নিতে, আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে, অত্যাচারিতকে সাহায্য করতে, কসম পূর্ণ করতে, সালামের উত্তর দিতে এবং কেউ হাঁচি দিলে তার জন্য দোয়া করতে। অপরদিকে তিনি রূপার পাত্র (ব্যবহার), সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং 'দিবাজ', 'কুসি' এবং 'ইসতেবরাক' (বস্ত্র) পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

(সহী বুখারী,কিতাবুল জানায়েয)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর চ্যালেঞ্জ

আমার ইলহামের মাধ্যমে জাতির কল্যাণ এবং ইসলামের উপকার সাধন হয়েছে। আর এটিই অনেক গুরুত্বপুর্ণ মাপদণ্ড যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়ার প্রমাণ দেয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

ঐশী ইলহামের মাপদণ্ড

দুঃখের বিষয় এই যে, এরা তুচ্ছ ইলহাম খণ্ড ও স্বপ্ন নিয়ে বড়াই করে; কোন ইলহাম খোদার পক্ষ থেকে কি না কিম্বা শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত কি না, সেটা কোন কোন মানদণ্ড দিয়ে বিচার করবে, তারা তা বুঝে উঠতে পারে না। এর একমাত্র মানদণ্ড হল, (ঐশী ইলহাম) এর সঙ্গে ঐশী সাহায্য থাকে, অদৃশ্যের শক্তিশালী সংবাদ প্রকাশের ক্ষমতা, তার সঙ্গে থাকে প্রতাপান্বিত ভবিষ্যদ্বাণী। অন্যথায় এটি নিরর্থক কথাবার্তা যা মানুষের উপযোগী হতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি জলসায় দুরে বসে কোন মহিমান্বিত বাদশাহ্‌র কথা এমনিই শুনে নেয় আর এসে দাবি করে যে 'আমি অমুক বাদশাহ্‌র কথা শুনেছি'- তাতে তার বা অন্যদের কি উপকার হবে? রাজা-বাদশাহের নৈকট্যভাজন হওয়ার পর মানুষের মধ্যে যে লক্ষণ প্রকাশিত হয় তার মহিমা বিচিত্র; যাকে দেখে মানুষ বলে ওঠে, অমুক ব্যক্তি আসলে বাদশাহর পার্ষদ। যদি আমার ইলহামও সেই প্রকার সাধারণ এবং নিরর্থক টুকরো হত আর প্রত্যেক ইলহামে অদৃশ্যের সংবাদ এবং শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী না থাকত, তবে আমি সেগুলিকে তুচ্ছ মনে করতাম। লেখরাম সংক্রান্ত ইলহামের তুল্য কোন ইলহাম-ই কেউ দেখাক। আমার ইলহামের মাধ্যমে জাতির কল্যাণ এবং ইসলামের উপকার সাধন হয়েছে। আর এটিই অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাপদণ্ড যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়ার প্রমাণ দেয়। আমার প্রতি খোদার আচরণ ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও তাঁর নিদর্শন আমার সমর্থনে বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা করে। এগুলির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পর্কে, কিছু আমার সন্তান-সন্ততি এবং কিছু আমার পরিবারবর্গের সম্পর্কে, কিছু আমার শুভাকাঙ্খী বন্ধুদের সম্পর্কে আর কিছু সাধারণ মানুষ সম্পর্কে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮১)

বর্ণনার উপর ভিত্তি করে কুরআন করীমের উপর আপত্তি করা আশ্চর্যের। অবশ্যই আমরা ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বাইবেলের কতিপয় বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি, কিন্তু তা তখনই, যখন যৌক্তিক দিক থেকে এবং অন্যান্য ইতিহাস কিম্বা কুরআন করীমের সঙ্গে সমন্বয়পূর্ণ হয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউসুফের ৮১ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

যে ভাইয়ের সম্পর্কে 'কাবিরুহুম'বলা হয়েছে, এমনটি প্রতীত হয় যে তার অন্তরে, কিছুটা হলেও, খোদা ভীতি ছিল। কেননা প্রথমত সে তার ভাইদেরকে নিজের পিতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করে, দ্বিতীয়ত সে তার নিজের অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে পীড়াপীড়ি করে। সে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পিতা অনুমতি না দেয় বা খোদা তালা স্বয়ং কোন মীমাংসা না করে দেন, আমি এখান থেকে যাব না। খোদা তা'লার মীমাংসার অর্থ হতে পারে, তার মনের মধ্যে একথা ঘুরপাক খাচ্ছিল যে যদি কোন প্রকারে বিন ইয়ামিন ছাড়া পেয়ে যায় আর আমি তাকে সঙ্গে করে ফিরে যাই।

হযরত ইউসুফের সব থেকে বড় ভাইয়ের নাম ছিল রোবিন আর বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে যে ভাই সেই সময় বাড়ি ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিল সে ছিল ইহুদা, যে কিনা চতুর্থ নম্বর ভাই ছিল। খৃষ্টান লেখকরা এখানে আপত্তি করে যে, কুরআনের লেখকরা ইতিহাসও জানে না। কুরআন ইহুদার কথাকে রোবিনের কথা বলে দাবি করছে। খৃষ্টান গ্রন্থকারদের এমন আপত্তি দেখে আমি আশ্চর্যই হই। তারা এমনভাবে বাইবেলের উল্লেখ করে যেন সেটি সব থেকে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ। অথচ খৃষ্টান লেখকদের বইপুস্তক এমন দলিল প্রমাণে পরিপূর্ণ যা ঐতিহাসিকভাবে বাইবেলের মর্যাদাকে অনেকাংশে খাটো করে দেয়। প্রাচীন ইতিহাসের কথা না-ই বলা গেল, মূসার গ্রন্থে মূসার যে সফর বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেগুলির সত্যতার বিষয়ে খৃষ্টান গবেষকরা নিজেরাই বিশ্বাসী নয়, আর সেগুলি ভৌগলিক অবস্থা এবং সে যুগের অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ ও বাইবেলের অভ্যন্তরীন সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে

(শেষাংশ শেষের পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

খুতবার শেষাংশ.....

রাওয়ালপিণ্ডি জেলার নায়েব আমীর ছিলেন। ২০১৯ সন থেকে ২০২১ সন পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি রাওয়ালপিণ্ডি জেলার আমীর হিসেবে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। প্রায় ২০ বছর তিনি জামা'তের সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। মরহুম অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, দরিদ্রদের প্রতি যত্নবান, জামা'তের কাজ করাকে খোদার কৃপা জ্ঞান করে সম্পাদনকারী ছিলেন আর নিজ সন্তানদেরও এই অনুপ্রেরণাই যুগিয়েছেন। অন্তিম অসুস্থতার প্রকোপের মধ্যেও জামা'তের কাজের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র থেকে কোন কর্মকর্তা যখনই ডাকতেন তৎক্ষণাৎ চলে যেতেন এবং নিজের অসুস্থতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তার ক্যান্সার ছিল, আর পাশাপাশি নিজের চিকিৎসাও করাচ্ছিলেন। এতদসত্ত্বেও সেবার জন্য সর্বদা উপস্থিত থাকতেন এবং কখনো না বলেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো, কিরগিজস্তানের আহমদী জনাব কোনকবেক উমর বেকোভ (Konokbek Omurbekov) সাহেবের। (তিনি) গত ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে সাতষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। কিরগিজস্তানের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইলিয়াস কুবাতোভ (Ilyas Kubatov)সাহেব লিখেন, অধমের সাথে জনাব কোনকবেক সাহেবের পনেরো বছরের অধিককালের সম্পর্ক। মরহুম আহমদীয়া জামা'ত, কিরগিজস্তানের প্রাথমিক আহমদীদের একজন ছিলেন। তিনি ২০০০ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত আহমদী ছিলেন। সর্বদা জামা'তের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করতেন আর নিয়মিত জামা'তের চাঁদা এবং অন্যান্য আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিতেন। সময়মতো নিজের ওয়াদা পরিশোধ করতেন। সময়মত পাঁচবেলার নামায পড়তেন এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর যুগে নিজের যৌবনকালে মরহুম দেশের বিভিন্ন বড় বড় সংগঠন এবং ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন আর তার বিশ্বস্ততা, সদাচার ও পরিশ্রমের কারণে সবাই তার ভূয়সী প্রশংসা করত। জীবনের শেষ বছরগুলোতে যখন কোন চাকরি ছিল না, তখন তিনি বইপুস্তক বিক্রি করতেন, বিশেষভাবে ইসলামী বইপুস্তক বিক্রি করতেন। কিরগিজস্তানে (আহমদীয়া) জামা'তের কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে তিনি নিয়মিত মানুষের মাঝে জামা'তের পুস্তকাদি এবং অনূদিত কুরআনবিতরণ করতেন। তবলীগের মাধ্যমে তিনি অনেক মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছিয়েছেন। মরহুম তার পেছনে স্ত্রী এবং সাত বছরের ছেলে সন্তান রেখে গেছেন। ইনি তার দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম স্ত্রী'র সাথে তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার (গর্ভে)ও সন্তানাদি আছে, সেই সন্তানরা সাবালক হলেও সম্ভবত তারা আহমদী নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, রাশিয়ান ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ছাপা হলে তিনি বিভিন্ন স্থানে ভুল চিহ্নিত করেন। তখন আমি বলি, আপনি পুরো কুরআন শরীফ পড়ুন এবং যেসব স্থানে ভুল আছে তা চিহ্নিত করে দিন। তখন তিনি দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই পুরো কুরআন শরীফের অনুবাদ পাঠ করে ভুলগুলো চিহ্নিত করে দেন। মুবাল্লেগ সাহেব আরো লিখেন, নামাযের জন্য খুবই সুন্দরভাবে ওযু করতেন আর তাকে নামায পড়তে দেখে ঈর্ষা হতো। জনাব উযগেনবায়েভ আরতুর (Uzgenbaev Artur) সাহেব বলেন, সত্য কথা হলো, কোনকবেক সাহেবই আমার কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যখনই আমি কোন প্রশ্ন করতাম তিনি আমাকে বিস্ময়কর ভঙ্গিতে উত্তর দিতেন আর তার উত্তর হতো যুক্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। জনাব কোনকবেক সাহেব অনেক উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, ধৈর্য ও সহনশীল মানুষ ছিলেন। তার চরিত্র ও উন্নত বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমি জামা'তভুক্ত হই। (হুযূর বলেন) আমি যখন নফল রোযা রাখার ও দোয়া করার তাহরীক করি তখন থেকে তিনি (প্রতি) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তাকে যখন বলা হয়, সপ্তাহে একদিন রোযা রাখুন, তখন তিনি বলেন, আমি সোমবারও রোযা রাখি আর বৃহস্পতিবারও রাখি, যাতে খিলাফতের প্রত্যেক আহবানে সাড়া প্রদানকারী হতে পারি। খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, নিয়মিত রাশিয়ান ভাষায় জুমুআর খুতবা শুনতেন। খুবই বিনয়ী ও বিনম্র মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্ত ছিলেন। যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, গভীর আগ্রহের সাথে তবলীগের কাজ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা এবং দয়াসুলভ আচরণ করুন। সকল প্রয়াতের মর্যাদা উন্নীত করুন আর তাদের বংশধরদের মাঝেও তাদের পুণ্যকাজের ধারা বহমান করুন। (আমীন)

(রিপোর্ট শেষ পাতার পর...)

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

এন.ডি.আর রেডিওর সাক্ষাতকার গ্রহণ।

এরপর অনুষ্ঠান অনুযায়ী অতিথিদেরকে রাতের খাবার দেওয়া হয়। নিশিভোজের অব্যবহিত পরেই এন.ডি.এ রেডিও-র এক সাংবাদিক প্রতিনিধি হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, পরধর্ম সহিষ্ণুতা এবং সহনশীলতার বিষয়ে আপনি যে ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করেছেন, সেগুলি সৌদি আরব এবং পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশগুলি মেনে চলে না কেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার কাজ কেবল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করা। আমি কারো উপর জোর খাটাতে পারি না বা কাউকে বাধ্য করতে পারি না। যতদুর আমাদের জামাতের সম্পর্ক, আমি সব সময় তাদেরকে এই উপদেশই দিয়ে থাকি, তারা যেন ইসলামের প্রকৃত ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা মেনে চলে। আর আমি যেখানে যাই বা যেখানেই আমি কিছু বলার সুযোগ পাই- আমি তাদেরকে একথাই বলে থাকি। আমি তো তাদেরকে জোর করতে পারি না। কিন্তু সর্বত্র এই বার্তাই দিয়ে থাকি যে ইসলামের সুনাম হানি করো না। এমনকি একবার আমি তাদেরকে সরাসরি নাম করে বলেছি যে ইসলামের নামে দুর্নাম বয়ে এনো না। ইসলাম তো শান্তির ধর্ম। দোহাই তোমাদের, ধর্মের খাতিরে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার পরিবর্তে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা শিরোধার্য কর।

এর পর সেই সংবাদ প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন যে, জামাত আহমদীয়া জার্মানীর ভবিষ্যত সম্পর্কে হুযুর আনোয়ারের মতামত কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে জার্মানীতে জামাত অত্যন্ত সক্রিয়। যুবক শ্রেণী শিক্ষিত। আমাদের অল্পবয়সীরা যারা স্কুলে পড়ছে, তাদের মধ্যে বেশ মেধাবী এবং যোগ্য ছাত্র রয়েছে। অনুরূপভাবে যুবকদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ও স্নাকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করছে। অনেকে পি.এইচ ডি এবং গবেষণাও করছে। আমি যুবক সম্প্রদায়কে একথাই বলে আসি যে, জাগতিক জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজেদের মৌলিক কর্তব্য অর্থাৎ স্রষ্টাকে চেনা এবং তাঁর শিক্ষা ও আদেশাবলী শিরোধার্য করতে ভুলো না।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া।

মসজিদ বায়তুল কাদির মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা শ্রেতাদের মনে গভীর ছাপ রাখে। অতিথিদের মধ্য থেকে অনেকেই নিজেদের অকপট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন- খলীফাতুল মসীহ্র ন্যায় মহান ব্যক্তিত্ব ক্ষমাপ্রার্থনা করে আমাদের মন জয় করে ফেলেছেন। তিনি কেবল আহমদীদেরই খলীফা নন, আমাদেরও খলীফা, আমাদের সকলের খলীফা।

একজন অতিথি বলেন: খলীফাতুল মসীহ অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যগুলির বিষয়ে ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করে তাদের বক্তব্যগুলিকে অলঙ্কৃত করেছেন।

প্রতিবেশি এক ভদ্রমহিলা বলেন: মসজিদ নির্মাণের পূর্বে আমি জামাত সম্পর্কে মোটেই জানতাম না। এই প্রথম আমি ইসলামের এমন নতুন রূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলাম, যা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ছিলাম। কেননা আমি আপনাদেরকে জানতাম না।

ভদ্রমহিলা বলেন: আপনাদের খলীফাকে দেখে মনে হল যেন তিনি আমাদের একান্ত আপন। তাঁর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তাঁর মধ্যে মানবতার প্রতি ব্যকুলতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি আগন্তকদের মত বলছিলেন না, বরং মনে হচ্ছিল যেন তিনি আমাদেরই মধ্য থেকে একজন।

এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পর বলেন: আমাদেরকে কিছুটা অপেক্ষা করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু আপনাদের খলীফা যেভাবে আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন এবং ক্ষমা চেয়ে নিলেন তা খুবই সুন্দর রীতি ছিল। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।" (ক্রমশ....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)**

জুমআর খুতবা

আবু আব্দুল্লাহ্, অর্থাৎ উসমানের সাথে উত্তম আচরণ করবে। কেননা চারিত্রিক দিক থেকে তিনি আমার সাথে আমার সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য রাখেন। (আল হাদীস)

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ, যুন নুরাইন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়াতের বিস্তারিত আলোচনা

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, আমি আমার মহা প্রতাপান্বিত প্রভু-প্রতিপালকের নিকট দোয়া করেছি যেন তিনি এমন কোন ব্যক্তিকে আগুনে প্রবেশ না করান, যে আমার জামাতা বা আমি যার জামাতা।

আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে কোন বিষয়কে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা.)-এর চেয়ে উত্তম কাউকে দেখি নি, যদিও তিনি বেশি কথাবলা থেকে বিরত থাকতেন।

চার জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েবের ঘোষণা, যাঁরা হলেন-

মুবাশ্বির আহমদ রাঁদ সাহেব , সাবেক আমীর জামাত মাননীয় মুনীর আহমদ ফর্রখ সাহেব, (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান), ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ লতীফ সাহেব (সাবেক জেলা আমীর, রাওয়ালপিণ্ডি) এবং মাননীয় কোনকবেক উমর বেকোফ সাহেব (কিরঘিস্তান)

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১৯ ফেব্রুয়ারী,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১৯ আমান, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছিল। তাঁর শাহাদাত এবং শাহাদাত পরবর্তী ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও লিখেছেন। শাহাদাতের পরের দিনগুলো সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি নিম্নরূপ:এরপর মদিনা ঐ সকল নৈরাজ্যবাদীদের দখলে চলে আসে আর সেই দিনগুলোতে তারা যে কার্যকলাপ করেছে, তা সত্যিই হতবাক করার মতো। হযরত উসমান (রা.)-কে তারা শহীদ তো করেছিল-ই, তাঁর মরদেহ দাফন করার বিষয়েও তাদের আপত্তি ছিল আর তিন দিন পর্যন্ত তাঁকে দাফন করা সম্ভব হয় নি। অবশেষে সাহাবীদের একটি দল সাহস করে রাতের বেলায় তাঁকে দাফন করে। তাদের পথেও নৈরাজ্যবাদীরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, কিন্তু কতক লোক কঠোরভাবে তাদেরকে মোকাবিলা করার হুমকি দিলে তারা পিছপা হয়।

(ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৩৩৩)

হযরত উসমান (রা.)-সম্পর্কে মহানবী (সা.) বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা মহানবী (সা.) একটি বাগানে প্রবেশ করেন আর আমাকে বাগানের দরজায় পাহারা দেওয়ার আদেশ দেন। ততক্ষণে এক ব্যক্তি এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চায়। মহানবী (সা.) বলেন, তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি দেখলাম, তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। এরপর আরেক ব্যক্তি আসে এবং বাগানের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চায়। তিনি (সা.) বলেন, তাকে আসতে দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি দেখলাম, তিনি ছিলেন হযরত উমর (রা.)। এরপর আরো এক ব্যক্তি আসেন এবং বাগানে প্রবেশের অনুমতি চান। তখন তিনি (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। অতঃপর বলেন, তাকে আসতে দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। তবে সে একটি বড় বিপদে নিপতিত হবে। আমি দেখলাম, তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৩৬৯৫)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদ পাহাড়ে আরোহন করেন। তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)। উহুদ পাহাড় কাঁপছিল। তিনি (সা.) বলেন, হে উহুদ! থাম। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত মহানবী (সা.) নিজ পা দ্বারা মাটিতে আঘাতও করেছিলেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমার বুকে এক নবী, এক সিদ্দিক এবং দু'জন শহীদ অবস্থান করছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৩৬৯৯)

হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক (আসন্ন) নৈরাজ্যের উল্লেখ করে বলেন, এই ব্যক্তি সেই নৈরাজ্যের সময় অত্যাচারিত অবস্থায় নিহত হবে। হযরত উসমান (রা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি (সা.) এ কথা বলেছিলেন।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭০৮)

হযরত উসমান (রা.) যে সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে হাদীসে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো, উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবা বর্ণনা করেন, যেদিন হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল, সেদিন তাঁর খাজাঞ্চির কাছে তাঁর তিন কোটি পাঁচ লক্ষ দিরহাম আর দেড় লক্ষ দিনার পড়ে ছিল এবং সেগুলো সব লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া 'রাবাযা' নামক স্থানে তিনি এক হাজার উট রেখে গিয়েছিলেন। 'রাবাযা' হেজাযের পথে মদিনা থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। একইভাবে বারাদিস আর খায়বার ও ওয়াদিউল-কুরায় দুই লক্ষ দিনার সমপরিমাণ সদকার সম্পদ রেখে যান; যা থেকে তিনি সদকা দিতেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১৩০)

পূর্বে এ বিষয়টিরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি (রা.) বলেন, আমি এক ধনী ব্যক্তি ছিলাম। কিন্তু আমার কাছে এখন মাত্র দুটি উট রয়েছে- যা আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে রেখেছি।

(ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ২৯৪)

এটি সেই সময়ের কথা হতে পারে যখন জাতীয় কোষাগারে এমন সম্পদ ছিল যা বর্ণনাকারী হযরত উসমান (রা.) এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে

মনে করেছেন অথবা এটি তাঁর (রা.) ব্যক্তিগত সম্পদ হলেও তিনি তখন ব্যক্তিগত কাজে এগুলো ব্যয় করতেন না, বরং সদকা ও জাতীয় প্রয়োজনেই তা খরচ করতেন। যাহোক এটি একটি রেওয়ায়েত যা আমি শুনিয়ে দিলাম। এর পূর্বেও তার নিজের বরাতে একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করা হয়েছে কোষাগারের খাজাঞ্চি সম্পর্কিত। যাদেরকে কোষাগার সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল- তা থেকেও এটি প্রকাশ পায় যে, তা জাতীয় সম্পদ ছিল, যার সুরক্ষার জন্য তিনি নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ করেছিলেন।

(ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২৯)

সাহাবীগণ হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হলো, হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি আমাদেরকে হযরত উসমান (রা.) এর বিষয়ে কিছু বলুন। হযরত আলী (রা.) বলেন, তিনি তো এমন মানুষ ছিলেন যিনি উর্ধ্বলোকেও 'যুন্নূরাইন' হিসাবে আখ্যায়িত হতেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৩৭৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতেও তিনি যুন্নূরাইন ছিলেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.) আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) যখন হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পান তখন তিনি বলেন, তারা তাকে হত্যা করেছে, অথচ তিনি তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী এবং তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৩৭৮)

মহানবী (সা.) তাঁর জামাতাদের ব্যাপারে যে দোয়া করেছেন, সে সম্পর্কেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

'আল-ইস্তিআব'-এ লিখিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, আমি আমার মহা প্রতাপান্বিত প্রভু-প্রতিপালকের নিকট দোয়া করেছি যেন তিনি এমন কোন ব্যক্তিকে আগুনে প্রবেশ না করান, যে আমার জামাতা বা আমি যার জামাতা।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬)

হযরত উসমানের পোশাক ও অবয়ব সম্পর্কে বলা হয়, মাহমুদ বিন লাবিদ এ বিষয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত উসমান বিন আফ্ফানকে একটি খচ্চরের ওপর দুটি হলুদ চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেন।

হাকাম বিন সাল্‌দ বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, তিনি হযরত উসমানকে বক্তৃতারত দেখেছেন, যখন কিনা তার গায়ে কালো রংয়ের চাদর ছিল এবং তিনি মেহেদি রংয়ের কলপ লাগিয়েছিলেন। সুলায়েম বিন আবু আমের বর্ণনা করেন, তিনি হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর গায়ে একটি ইয়েমেনী চাদর দেখেন, যার মূল্য ছিল একশ' দিরহাম। মুহাম্মদ বিন উমর বর্ণনা করেন, আমি আমর বিন আবদুল্লাহ্, উরওয়া বিন খালেদ এবং আব্দুর রহমান বিন আবু যিনাদের কাছে হযরত উসমানের অবয়ব ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা সকলেই অভিন্ন মতামত দিতে গিয়ে বলেন, তিনি খর্বাকৃতিরও ছিলেন না, আবার খুব লম্বাও ছিলেন না। তাঁর মুখাবয়ব ছিল খুব সুন্দর, ত্বক কোমল, দাঁড়ি ঘন ও লম্বা, গায়ের রং গোধুম বর্ণ, অস্থিসন্ধি দৃঢ় এবং প্রশস্ত কাঁধ আর মাথার চুল ছিল ঘন। তিনি দাঁড়িতে হলুদ কলপ লাগাতেন। ওয়াকেদ বিন আবু ইয়াসের বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) নিজের দাঁত স্বর্ণের তার দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছিলেন। মুসা বিন তালহা বর্ণনা করেন, আমি হযরত উসমানকে দেখেছি জুমুআর দিন তিনি যখন বাহিরে আসতেন তখন তাঁর পরনে দুটি হলুদ বর্ণের চাদর থাকত। এরপর তিনি মিম্বরে উঠতেন, তারপর মুয়ায্যিন আযান দিত। অতঃপর মুয়ায্যিন যখন নীরব হতো (অর্থাৎ আযান শেষ করত), তখন তিনি একটি বাঁকা হাতলযুক্ত লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াতেন এবং লাঠি হাতে নিয়ে খুতবা দিতেন। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নামতেন এবং মুয়ায্যিন ইকামত দিত। হাসান বলেন, আমি হযরত উসমানকে নিজ চাদরকে বালিশ বানিয়ে মসজিদে শুয়ে থাকতে বা ঘুমাতে দেখেছি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২-৩৪)

মূসা বিন তালহা বর্ণনা করেন, জুমুআর দিন হযরত উসমান একটি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সুদর্শন ছিলেন। তার গায়ে দুটি হলুদ বর্ণের কাপড় থাকত; একটি গায়ের চাদর, অপরটি তহবন্দ বা লুঙ্গি ; এ অবস্থায় তিনি মিম্বরে উঠতেন এবং সেখানে বসতেন।

(মাজমুয়ায়েয যোওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফোয়ায়েদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫৭)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর একটি আংটি ছিল যার ওপর 'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্' খচিত ছিল এবং তা মহানবী (সা.) ব্যবহার করতেন। সেটি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন রোমের বাদশাহ্‌র নিকট পত্র প্রেরণ করতে চাইলেন তখন তাঁর (সা.) নিকট নিবেদন করা হয় যে, পত্রটিতে যদি সীলমোহর করা না হয় তাহলে তিনি তা পড়বেন না। তখন মহানবী (সা.) রুপার একটি আংটি তৈরি করান যাতে 'মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ্' খোদাই করা ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যেন তার হাতে এখনও সেই আংটির শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ সেই স্মৃতি এত সতেজ!

(সহী বুখারী, কিতবুল লিবাস, হাদীস-৫৮৭৫)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় সেই আংটিটি তাঁর (সা.) হাতেই ছিল। তাঁর (সা.) পরে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে ছিল আর হযরত আবু বকরের পর তা হযরত উমরের হাতে ছিল। অতঃপর যখন হযরত উসমান (রা.)-এর যুগ এল, তখন একবার তিনি (রা.) আরীস কূপের কিনারায় বসে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (রা.) আংটিটি আঙুল থেকে খুলে হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে থাকেন এবং দুর্ঘটনাবশত তা কূপের মধ্যে পড়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে ৩ দিন পর্যন্ত সেটি খুঁজতে থাকি, এমনকি কুয়ার সমস্ত পানি বের করে ফেলা হয় কিন্তু সেই আংটিটি পাওয়া যায় নি।

এই আংটিটি হারিয়ে যাওয়ার পর হযরত উসমান (রা.)ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি এটিকে খুঁজে বের করবে তাকে প্রচুর ধনসম্পদ উপহার দেওয়া হবে। এ আংটিটি হারিয়ে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত ছিলেন। তিনি (রা.) যখন সেই আংটি পাওয়ার বিষয়ে নিরাশ হয়ে যান, তখন হুবহু তেমনই একটি আংটি তৈরি করার নির্দেশ দেন। অতঃপর হুবহু তেমনই একটি আংটি তৈরি করা হয় যাতে 'মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ্' খোদিত ছিল। সেটি তিনি আমৃত্যু পরিধান করে রেখেছিলেন আর অজ্ঞাত এক ব্যক্তি তার শাহাদাতের সময় সেই আংটিটি নিয়ে যায়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, হাদীস-৫৮৭৯) (তারিখে তাবারী ৫ম খণ্ড, পৃ: ১১১-১১২)

হযরত উসমান (রা.) 'আশারায়ে মুবাশ্বেরা' তথা দশজন (জান্নাতের) সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আখনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে থাকাকালে এক ব্যক্তি অশালীনভাবে হযরত আলী (রা.)-এর নাম উচ্চারণ করে। তাই হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি মহানবী (সা.) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি, দশ ব্যক্তি জান্নাতে যাবেন। মহানবী (সা.) স্বয়ং, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.), হযরত সা'দ বিন মালেক (রা.) জান্নাতে যাবেন এবং আমি ইচ্ছা করলে দশম ব্যক্তির নামও বলতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মানুষ জিজ্ঞেস করে, দশম ব্যক্তি কে? তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করে দশম ব্যক্তি কে? তখন তিনি বলেন, সাঈদ বিন যায়েদ, অর্থাৎ আমি নিজে। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস-৪৬৪৯) এটি আমি এর পূর্বেও তাঁর (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে একস্থানে বলেছিলাম। জান্নাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর সাহচর্য সম্পর্কে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীর একজন করে ঘনিষ্ঠ সাথী হয়ে থাকে। জান্নাতে আমার ঘনিষ্ঠ সাথী হবেন হযরত উসমান (রা.)।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৯৮)

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা একবার মহানবী (সা.)-এর সাথে একটি বাড়িতে মুহাজেরদের একটি দলের সাথে অবস্থান করছিলাম যেখানে হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন অওফ এবং সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সমপর্যায়ের ব্যক্তির সাথে দণ্ডায়মান হও। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং তার সাথে আলিঙ্গন করে বলেন, أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَوَلِيِّي فِي الْآخِرَةِ অর্থাৎ তুমি এই পৃথিবীতেও আমার বন্ধু এবং পরকালেও।

(মাজমুয়ায়েয যোওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফোয়ায়েদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৬৬)

হযরত উসমান (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস আবু সাহলাহ্ বর্ণনা করেন, 'ইয়াওমুদ্ দ্বার' অর্থাৎ যেদিন বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.) -কে গৃহবন্দি করে শহীদ করেছিল সেদিনের কথা, আমি হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট নিবেদন করি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এই বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করুন। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-ও তাকে বলেছিলেন যে, হে আমীরুল

মু'মিনীন! আপনি এই বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করুন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যুদ্ধ করব না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার সাথে একটি বিষয়ে ওয়াদা করেছিলেন, সুতরাং আমি চাই তা যেন পূর্ণ হয়।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা লি ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৪৮৩-৪৮৪, দারুল ফিকর বাইরুত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে মুনাফেকরা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা, উহুদের যুদ্ধ থেকে পলায়ন এবং বয়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ না করা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেছিল। উসমান বিন মওহাব বর্ণনা করেন, মিশরীয়দের জনৈক ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে আসলে সে দেখে যে, কতিপয় লোক বসে আছে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে কিছু কথা বলে। সে মানুষকে জিজ্ঞেস করে, এরা কারা? মানুষ তাকে উত্তরে বলে, এরা কোরায়শী। সে জিজ্ঞেস করে, এদের মধ্যে ওই বৃদ্ধ লোকটি কে? মানুষ উত্তরে বলে, তিনি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)। সে বলে, হে ইবনে উমর (রা.)! একটি বিষয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি আপনি আমাকে উত্তর দিন। হযরত উসমান উহুদের দিন পালিয়ে গিয়েছিলেন, এটি কি আপনি জানেন? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। এরপর সে জিজ্ঞেস করে, তিনি (রা.) বদরের যুদ্ধেও অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি, এ বিষয়টি কি আপনি জানেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি জানেন তিনি বয়আতে রিযওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন, অর্থাৎ তাতে অংশগ্রহণ করেন নি? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। এতে সেই ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে বলে, 'আল্লাহু আকবার'। হযরত ইবনে উমর তাকে বলেন, এদিকে আস। তুমি যেহেতু আপত্তি করেছ তাই এখন আমি তোমাকে প্রকৃত ঘটনা বলছি। উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি যে চলে গিয়েছিলেন, এ প্রসঙ্গে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করেছিলেন। তখনকার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সর্বত্র গুজব রটে গিয়েছিল যে, কাফেররা মহানবী (সা.)-কেও শহীদ করে দিয়েছে। তখন এমন পরিস্থিতিতে সাময়িক অনিশ্চয়তা ও উপায়হীনতার বশবর্তী হয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন। আর রইল বদরের যুদ্ধে হযরত উসমান (রা.)-এর অংগ্রহণ না করার বিষয়- এর কারণ ছিল, তাঁর সহধর্মিনী তথা নবী তনয়া অসুস্থ ছিলেন আর মহানবী (সা.) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীর কাছেই থাক, তুমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ন্যায়ই প্রতিদান ও গনিমতের সম্পদ লাভ করবে। বাকি রইল বয়আতে রিযওয়ানে তাঁর অনুপস্থিত থাকার বিষয়, স্মরণ রাখবে! মক্কার উপত্যকায় যদি হযরত উসমান (রা.)-এর চেয়ে বেশি সম্মানিত অন্য কেউ থাকত তাহলে হযরত উসমানের স্থলে মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তিকেই কাফেরদের প্রতি দূত হিসেবে প্রেরণ করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে কাফেরদের কাছে প্রেরণ করেন আর বয়আতে রিযওয়ান সেসময় সংঘটিত হয় যখন তিনি মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। বয়আতে রিযওয়ানের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের ডান হাত দ্বারা বাম হাতের প্রতি ইশারা করে বলেছিলেন, এটি উসমানের হাত। তিনি তার বাম হাত অপর হাতে দৃঢ়ভাবে রেখে বলেন, এটি উসমানের জন্য। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) একথা বলার পর সেই ব্যক্তিকে বলেন, এখন তুমি এসব কথা নিজের সাথে নিয়ে যাও। আর স্মরণ রেখো, এটি কোন আপত্তিকর বিষয় নয়।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৩৬৯৮) এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় মসজিদ নববীর সম্প্রসারণের কাজ হয়েছিল, তাতেও হযরত উসমান (রা.) অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। আবু মালীহ্ নিজ পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মদিনার মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য একটি ভূখণ্ডের আনসারী মালিককে বলেন, এই ভূখণ্ডের বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর থাকবে, কিন্তু সে এটি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর হযরত উসমান এসে সেই ব্যক্তিকে বলেন, এই এক খণ্ড জমির জন্য আমি তোমাকে দশ হাজার দিরহাম দিচ্ছি। তিনি (রা.) তার কাছ থেকে এই জমিটি ক্রয় করে নেন। অতঃপর হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এই জমিটুকু আমার কাছ থেকে ক্রয় করে নিন যা আমি আনসারী সাহাবীর কাছ থেকে ক্রয় করেছি। তখন তিনি (সা.) উক্ত জমি হযরত উসমান (রা.)-এর কাছ থেকে জান্নাতে একটি ঘরের বিনিময়ে ক্রয় করে নেন আর হযরত উসমান (রা.)-কেও একই কথা বলেন যে, জান্নাতে তোমার জন্য ঘর থাকবে। হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তা ক্রয় করে নিয়েছি। এরপর মহানবী (সা.) ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে একটি ইট স্থাপন করেন। এরপর তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডাকেন আর তিনি (রা.)-ও একটি ইট রাখেন। অতঃপর হযরত উমর (রা.)-কে ডাকা হয় এবং তিনিও একটি ইট রাখেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) আসেন আর তিনিও একটি ইট স্থাপন করেন। এরপর মহানবী (সা.) অবশিষ্ট লোকদের বলেন, এখন তোমরা সবাই ইট রাখ; কথামতো সবাই ইট রাখে।

(মাজমুয়ায়ে যোওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফোয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৬৫)

আর এভাবে এই (মসজিদের) যে সম্প্রসারণ হয়েছিল তার ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়।

সুমামা বিন হাযাম কুশায়েরি বর্ণনা করেন, আমি অবরোধের সময় উপস্থিত ছিলাম যখন হযরত উসমান (রা.) গৃহবন্দি অবস্থায় ঘর থেকে উঁকি দিয়ে লোকদের বলছিলেন, আমি আল্লাহ্ এবং ইসলামের কসম দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান যখন রসূলুল্লাহ্(সা.) মদিনায় আসেন তখন রূমা নামক কূপ ব্যতীত পানীয় জলের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। মহানবী (সা.) বলেন, কে আছে যে নিজের বালতি মুসলমানদের বালতির সাথে রূমা কূপে নামানোর জন্য ক্রয় করবে? অর্থাৎ সে নিজেও পান করবে আর মুসলমানরাও এখান থেকে পান করবে এবং এর বিনিময়ে জান্নাতে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান থাকবে। হযরত উসমান (রা.) বলেন, এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি আমার অর্থে সেই কূপ ক্রয় করি আর তাতে মুসলমানদের বালতির সাথে আমার বালতিও কূপে নামাই। আর আজ তোমরা আমাকে এখান থেকে পানি পান করতে বাধা দিচ্ছ আর আমাকে সমুদ্রের পানি পান করতে বাধ্য করতে চাও! জবাবে লোকেরা বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি সঠিক বলেছেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান যে, আমি আমার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে 'জায়শে উসরা' অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করেছিলাম। জবাবে লোকেরা বলে, আল্লাহ্‌র কসম! (ঘটনা) এমনটিই ছিল। এরপর তিনি (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান, মসজিদ নববীতে যখন নামাযীদের জন্য স্থান সংকুলান হচ্ছিল না তখন মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি অমুক পরিবারের কাছ থেকে এই জমি ক্রয় করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দিবে তার জন্য জান্নাতে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান থাকবে। অতঃপর আমি আমার নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে সেই জমি ক্রয় করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দিই। আর এখন তোমরা আমাকে সেই মসজিদে দুই রাকা'ত নামায আদায় করতেও বাধা দিচ্ছ? উত্তরে তারা বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আসলেই তাই। পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান যে, মহানবী (সা.) মক্কার 'সাবীর' নামক একটি পাহাড়ে ছিলেন এবং তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং আমি ছিলাম। পাহাড় যখন প্রকম্পিত হয় তখন মহানবী (সা.) এতে নিজ পদাঘাত করে বলেন, হে 'সাবীর' পাহাড়! তুমি স্থির হও, কেননা তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুই জন শহীদ দণ্ডায়মান রয়েছে। একথা শুনে তারা বলে, আল্লাহ্‌র কসম! ঠিক তাই। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহু আকবার; কা'বার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! তারা আমার সপক্ষে এই সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, আমি শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে যাচ্ছি।

(সুনান আননিসাঈ, কিতাবুল আহবাস, হাদীস-৩৬৩৮)

মসজিদ নববীর পুনঃসম্প্রসারণের অধিকাংশ কাজ হযরত উসমান (রা.)-এর যুগেই হয়েছিল। তাই এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও প্রারম্ভিক অবস্থা বা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত যে বর্ণনাই রয়েছে তা উপস্থাপন করছি। মহানবী (সা.)-এর যুগে মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি নোট এটিও রয়েছে যে, ১ম হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাস মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে মহানবী (সা.) স্বয়ং তাঁর পবিত্র হাতে মসজিদ নববীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তি প্রায় তিন হাত বা দেড় মিটার গভীর ছিল। ভিত্তির জন্য পাথর দ্বারা তৈরি ইটের দেওয়াল নির্মাণ করা হয় আর প্রাচীরের ওপরের অংশ কাঁচা ইট দিয়ে তৈরি করা হয় এবং ইট রোদে শুকানো হয়।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দরুদ শরীফ অধিকহারে পাঠ কর, যা অবিচলতা অর্জনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ও অভ্যাসগতভাবে নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যকে দৃষ্টিতে রেখে এবং তাঁর পদমর্যাদার উন্নতি ও সফলতার জন্য।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)

(জুস্তাজুয়ে মাদীনা, প্রণেতা- আব্দুল হামীদ কাদিরী, পৃ: ৪৩০)

মসজিদের প্রাচীর নির্মাণের ইতিহাস বর্ণনার সাথে সাথে মসজিদ সম্প্রসারণের ইতিহাসও এসে যাবে। মসজিদের প্রাচীর প্রায় পৌনে এক মিটার প্রশস্ত, ফুটের হিসাবে যা প্রায় দুই-আড়াই ফুট এবং প্রাচীরের উচ্চতা ছিল প্রায় সাত হাত বা সাড়ে তিন মিটার।

(জুস্তাজুয়ে মাদীনা, প্রণেতা- আব্দুল হামীদ কাদিরী, পৃ: ৪৩২)

মসজিদ নববীর নির্মাণ কাজ ১ম হিজরী সনের শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্পন্ন হয়।

(জুস্তাজুয়ে মাদীনা, প্রণেতা- আব্দুল হামীদ কাদিরী, পৃ: ৪৩৫)

হযরত খারেজা বিন যায়েদ বিন সাবেত বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তার মসজিদের দৈর্ঘ্য ৭০ হাত বা প্রায় ৩৫ মিটার এবং প্রস্থ ৬০ হাত বা প্রায় ৩০ মিটার রেখেছিলেন।

(জুস্তাজুয়ে মাদীনা, প্রণেতা- আব্দুল হামীদ কাদিরী, পৃ: ৪৩৭-৪৩৮)

মহানবী (সা.) এর যুগে ৭ম হিজরী সনের মহররম মাস মোতাবেক ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে মসজিদ নববীর প্রথম সম্প্রসারণ কাজ হয়। যখন মহানবী (সা.) খায়বারের সফল অভিযানের পর ফিরে আসেন, তখন তিনি (সা.) মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণের আদেশ দেন। মসজিদ কিবলার দিকে বা দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করা হয়নি, বরং বেশিরভাগ সম্প্রসারণ কাজ করা হয়েছিল উত্তর দিকে আর কিছুটা পশ্চিম দিকেও বর্ধিত করা হয়েছিল। উত্তর দিকে সাহাবীদেরকিছু ঘর ছিল। এই দিকে জনৈক আনসারী সাহাবীরও ঘর ছিল যার নিজের ঘর ছেড়ে দিতে কিছুটা দ্বিধা ছিল। যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) নিজের পকেট থেকে দশ হাজার দিরহাম মূল্য দিয়ে সেই ঘর ক্রয় করে নেন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। এভাবে মসজিদ নববীর বেশির ভাগ সম্প্রসারণ উত্তর দিকে ও পশ্চিম দিকে করা সম্ভব হয়। এই সম্প্রসারণের পর মসজিদের মোট আয়তন উভয়দিকে ১০০ × ১০০ হাত করে অর্থাৎ, ৫০মিটার দৈর্ঘ্য ও ৫০মিটার প্রস্থবিশিষ্ট হয়ে যায়।

(জুস্তাজুয়ে মাদীনা, প্রণেতা- আব্দুল হামীদ কাদিরী, পৃ: ৪৪৭-৪৪৮)

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে, ১৭ হিজরী সনে মসজিদ নববীর দ্বিতীয়বার সম্প্রসারণ কাজ হয়। হযরতআবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে মসজিদের দেওয়াল কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছিল আর ছাদ ছিল খেজুরের ডাল ও পাতা দ্বারা তৈরি। খেজুর গাছের কাণ্ড খুটি হিসেবে লাগানো হয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মসজিদ সে অবস্থায়-ই থাকতে দেন এবং এতে কোন পরিবর্তন বা সম্প্রসারণ করেন নি। হযরত উমর (রা.) মসজিদের পুনঃনির্মাণ এবং সম্প্রসারণ করিয়েছেন, কিন্তু এর আকৃতি ও গঠনে কোন ধরনের পরিবর্তন করেন নি। অর্থাৎ যেভাবে ছিল, পুরোনো অংশকে সেভাবেই এবং সেই ভিত্তিমূলেই রেখে দিয়েছেন। তিনিও ঠিক সেই স্থাপত্যকলায় নির্মাণ করেছিলেন, শুধুমাত্র সম্প্রসারণ করা হয়। ছাদ আগের মতোই খেজুর পাতারই থেকে যায়। তিনি শুধুমাত্র কাঠের খুঁটি লাগিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) ১৭ হিজরী সনে নিজ তত্ত্বাবধানে মসজিদ পুনঃনির্মাণের কাজ সম্পন্ন করান। এই সম্প্রসারণ কাজের পর মসজিদ নববীর মোট আয়তন (৫০মি × ৫০মি) তথা ২৫০০ বর্গমিটার থেকে বেড়ে (৭০মি × ৬০মি) তথা ৪২০০ বর্গমিটার বা দৈর্ঘ্যে ১৪০ হাত ও প্রস্থে ১২০ হাত হয়ে যায়। এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগেও মসজিদ নববী মহানবী (সা.)-এর যুগের অনুরূপই থাকে। যদিও হযরত উমর (রা.)-এর পুনঃনির্মাণের ফলে মসজিদ যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়।

(জুস্তাজুয়ে মাদীনা, প্রণেতা- আব্দুল হামীদ কাদিরী, পৃ: ৪৫৯)

এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণের কাজ হয়। এটি হিজরী ২৯ সালের ঘটনা। হযরত উসমান (রা.) মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ এবং পুনঃনির্মাণ করেন। মসজিদের সৌন্দর্যবর্ধন এবং এটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর নির্মাণের জন্য পাথর ও জিপসাম ব্যবহার করেন এবং কারুকার্য করেন। হযরত উসমান (রা.) মসজিদের প্রাচীর পাথর দিয়ে নির্মাণ করান, যার ওপর কারুকার্য করা ছিল আর মসজিদ নববীতে প্রথমবারের মতো সাদা রঙ হিসেবে চুনকাম করা হয়েছিল। ছাদে শিশুকাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল। হিজরী ২৪ সনে হযরত উসমান (রা.) যখন খলীফা নির্বাচিত হন তখন মানুষ তার কাছে মসজিদ নববীর সম্পসারণের জন্য আবেদন করে। তারা মসজিদের প্রাঙ্গন ছোট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করে। বিশেষভাবে জুমুআর নামাযে উপস্থিতি এত বেশি হতো যে, অধিকাংশ সময় মানুষকে মসজিদের বাহিরের অংশে নামায পড়তে হতো। এজন্য হযরত উসমান (রা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। সবাই এই মত প্রকাশ করেন যে, পুরোনো মসজিদ ভেঙে এর স্থলে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হোক। অর্থাৎ পূর্বের মসজিদ ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হোক। একদিন যোহরের নামাযের পর হযরত উসমান (রা.) মিম্বরে খুতবা দেন এবং বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আমি এ মসজিদটি ভেঙে এর স্থলে নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি- যে ব্যক্তিই মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে একটি ঘর দান করেন। আমার পূর্বে হযরত উমর ফারূক (রা.) ছিলেন আর তাঁর হাতে মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ আমার জন্য এক দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ। এছাড়াও আমি বিজ্ঞ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছি আর তাদের সর্বসম্মত মত হলো, মসজিদ নববীকে ভেঙে সেটিকে পুনরায় নির্মাণ করা উচিত।

হযরত উসমান (রা.) নতুনভাবে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা উত্থাপন করলে কিছু সাহাবী এ বিষয়ে তাদের আপত্তি উত্থাপন করেন। মসজিদ ভাঙা উচিত হবে না বলে তারা অভিমত রাখতেন। এদের মাঝে সেসব সাহাবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের বসতি মসজিদ নববীর একান্ত নিকটবর্তী ছিল এবং যাদের ঘরবাড়ি এই পরিকল্পনার আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সাধারণ জনতার অধিকাংশই এই পরিকল্পনা সমর্থন করে, কিন্তু গুটিকতক সাহাবী আপত্তি করেন। হযরত আফলাহ্ বিন হামীদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) যখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে মানুষের মতামত যাচাই করতে চান তখন মারওয়ান বিন হাকাম বলেন, নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো কাজ, কাজেই আপনি কেন মানুষের মতামত যাচাই করতে যাবেন? এ প্রেক্ষিতে হযরত উসমান (রা.) তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং তিরস্কার করে বলেন, তোমার মঙ্গল হোক! কোন বিষয়েই আমি মানুষের ওপর জোরজবরদস্তি করার পক্ষপাতী নই। অতএব আমি অবশ্যই তাদের সাথে পরামর্শ করব। তিনি বলেন, আমি আমার মতামত মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। আমি যে কাজই করব তা তাদের সম্মতি নিয়ে করব। এরপর তিনি যখন তাঁর পরিকল্পনার পক্ষে বিজ্ঞ সাহাবীদের আস্থা লাভে সক্ষম হন তখন তিনি মসজিদ নববীর উত্তর দিকে অবস্থিত বাড়িগুলো ক্রয় করে সেই জমিগুলো অধিগ্রহণ করেন। যদিও তিনি প্রতিদানস্বরূপ সেই সাহাবীদের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন, কিন্তু তথাপি গুটিকতক সাহাবী তাদের বাড়িঘর দিতে রাজি ছিলেন না আর প্রায় চার বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও কাঙ্ক্ষিত কোন সাফল্য অর্জিত হয় নি।

হযরত উবায়দুল্লাহ্ খুলানীর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত হলো, মানুষ যখন তাদের বাড়িঘর দিতে ইতস্তত করছিল এবং যুক্তিপ্রমাণ দীর্ঘায়িত হচ্ছিল তখন আমি হযরত উসমান (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা অনেক কথা বলে ফেলেছ। আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য যে-ই মসজিদ নির্মাণ করবে প্রতিদানে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে তেমনই প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

অনুরূপভাবে হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.) যখন মসজিদ নববীর পুনঃনির্মাণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, তখন মানুষের কাছে তার পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি আর মসজিদ নববীকে তারা সে অবস্থায়ই রাখতে জোর দেয় যেমনটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে ছিল। এ প্রেক্ষিতে তিনি (রা.) বলেন, যে-ই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতে তেমনই প্রাসাদ নির্মাণ করাবেন। মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) ২৯ হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মোতাবেক ৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাজের উদ্বোধন করেন। নতুন (মসজিদ) নির্মাণের ক্ষেত্রে কেবল ১০ মাস সময় ব্যয় হয় আর এভাবে ৩০ হিজরী সনের পহেলা মহররম মসজিদ নববী প্রস্তুত হয়ে যায়। তিনি নিজে কাজের তদারকি করতেন। সর্বদা দিনের বেলা রোযা রাখতেন এবং রাতের বেলা ঘুমের কারণে বাধ্য হলে মসজিদ নববীতেই বিশ্রাম করতেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন সাফিনা হতে বর্ণিত যে, আমি দেখেছি মসজিদ নির্মাণের জন্য চুনসুর্কি হযরত উসমান গনী (রা.)-এর নিকট আনা হতো। এছাড়া আমি এটিও দেখেছি যে, তিনি সর্বদা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ত্রীদের দিয়ে কাজ করাতেন আর নামাযের সময় হলে তাদের

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)

সাথে নামায পড়তেন এবং কখনো কখনো সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তেন। হযরত উসমান (রা.) মসজিদ নববীকে দক্ষিণে কিবলার দিকে সম্প্রসারিত করেছেন এবং এর কিবলার দেওয়াল সে জায়গা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন যেখানে তা আজও বিদ্যমান। উত্তর দিকে ৫০ হাত তথা প্রায় ২৫ মিটার সম্প্রসারিত করা হয় এবং পশ্চিম দিকেও কিছুটা সম্প্রসারণ করা হয়। অবশ্য পূর্ব দিকে যেখানে বরকতময় ঘরগুলো ছিল, সেদিকে কোন সম্প্রসারণ করা হয় নি। এরপর মসজিদ নববীর মোট আয়তন ২৪০০০ বর্গহাত, অর্থাৎ প্রায় ৬০০০ বর্গমিটারে দাঁড়ায়।

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে মসজিদের দরজার সংখ্যা ছিল ৬টি। প্রথমবার মসজিদ নববীতে পাথর খোদাই করে তাতে কারুকার্য করা হয় এবং এর চুনকাম করানো হয়। হযরত খারেজা বিন যায়েদের বর্ণনা অনুসারে হযরত উসমান (রা.) মসজিদ নববীর পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দেয়ালে ছোট জানালা রাখার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। মসজিদ নববীর সম্প্রসারণের জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে যেসব বাড়িঘর অধিগ্রহণ করতে হয়েছিল সেগুলোর মাঝে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর ঘরটিও ছিল। তাঁকে এর পরিবর্তে কিবলার দিকের দেওয়াল সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি ঘর দেওয়া হয়েছিল এবং একটি ছোট দরজার মাধ্যমে তার ঘরে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা সহজ করা হয়। এছাড়া হযরত জাফর বিন আবু তালেব (রা.)-এর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে তাদের বাড়ির অর্ধাংশ এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নেওয়া হয় আর একইভাবে হযরত আব্বাসের ঘরের কিছু অংশ ক্রয় করে মসজিদ নববীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিবলার দিকের দেওয়াল দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও মসজিদ নববীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা হলো, নবীজীর মেহরাবের স্থান, কিবলার জায়গাও সেটির বরাবর ততদূরই এগিয়ে নিতে হয় যতদূর কিবলামুখি দেওয়াল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটি ঠিক সেই স্থান ছিল যেখানে বর্তমানে আমরা উসমানী মেহরাব দেখতে পাই। সেখানে প্রতীকী মেহরাবও বানানো হয়েছিল। কাদামাটির পরিবর্তে তিনি নুড়ি পাথর ব্যবহার করিয়েছিলেন আর পাথর নির্মিত স্তম্ভগুলোর ভেতরে সীসার রড ব্যবহার করা হয়েছিল। এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল যেন নতুন স্তম্ভগুলো ঠিক সেই স্থানেই বসানো হয় যেখানে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র যুগে খেজুরগাছের স্তম্ভ গুলো ছিল।

নির্মাণকাজে যেসব উপকরণ এবং যেরূপ স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন ছিল তা ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি জেরুযালেমের বিখ্যাত 'সাখরা গম্বুজ' নির্মাণে রোমানরা ব্যবহার করেছিল। শিশু কাঠ দিয়ে ছাদ বানানো হয়েছিল, যা সীসার রড দেওয়া পাথরের স্তম্ভের ওপর স্থাপিত কড়িকাঠের ওপর বসানো হয়েছিল। যেহেতু হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাত নবীজীর মেহরাবে নামাযের ইমামতি করার সময় হয়েছিল, তাই ভবিষ্যতে যেন এমন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য হযরত উসমান (রা.) মেহরাবের স্থানে একটি 'মাকসূরা'ও (অর্থাৎ মসজিদে মুসল্লিদের সারির সামনে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান, যেখানে মিম্বর থাকে) নির্মাণ করান যা মাটির ইট দিয়ে নির্মিত ছিল এবং এতে গরাদ ও ছিদ্র রাখা হয়েছিল যাতে মুক্তাদিরা নিজেদের ইমামকে দেখতে পায়। এটি প্রথম নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল যা মসজিদ নববীতে নির্মাণ করা হয় আর যা পরবর্তীতে দামেস্কে বনু উমাইয়ার খলীফাদের নিরাপত্তাব্যবস্থার নিয়মিত অংশে পরিণত হয়েছিল।

(জুস্তাজুয়ে মাদীনা, প্রণেতা- আব্দুল হামীদ কাদিরী, পৃ: ৪৬৩-৪৬৫) (উর্দু লুগাত তারিখী ওসুলোঁ পর, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪৯২, 'মাকসূরা' শব্দের ব্যাখ্যায়)

অর্থাৎ দেওয়াল তুলে মেহরাবকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল, তবে মুক্তাদিরা ইমামকে দেখতে পেত। যাহোক, পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে মসজিদের সম্প্রসারণ হতে থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমানকে আমি হযরত সুলায়মানের সাথে তুলনা করি, তাঁরও ভবন নির্মাণের খুব শখ ছিল। হযরত আলী (রা.)-এর যুগে অবশ্যই অভ্যন্তরীণ বিশৃঙখলা ছিল। একদিকে ছিলেন মুআবিয়া এবং অপরদিকে ছিলেন আলী (রা.) আর এই বিশৃঙখলার কারণে মুসলমানদের রক্তও ঝরেছিল। ৬ বছর ইসলামের কোন কাজ হয় নি। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগ পর্যন্তই ইসলামের জন্য উন্নয়নমূলক সকল কার্যক্রম শেষ হয়ে যায় আর এরপর তো গৃহযুদ্ধই বেধে যায়।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৭৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মসজিদ কারুকার্যখচিত ও পাকা অট্টালিকাই হতে হবে তা আবশ্যক নয়, বরং কেবল জমি ঘিরে নেওয়া প্রয়োজন এবং সেখানে মসজিদের সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত আর বাঁশ বা তদ্রূপ ছাউনি জাতীয় কিছু দিয়ে দাও যেন (রোদ)বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। খোদা তা'লা কৃত্রিমতা পছন্দ করেন না। মহানবী (সা.)-এর মসজিদ কয়েকটি খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল আর সে ধারাই অব্যহত থাকে। পরবর্তীতে হযরত উসমানের যেহেতু অট্টালিকা নির্মাণের আগ্রহ ছিল, তাই তাঁর যুগে তিনি এটিকে পাকা করিয়েছিলেন। আমি মনে করি, ছন্দের দিক থেকে হযরত সুলায়মান (আ.) ও হযরত উসমান (রা.)-এর নামের মিল আছে, হয়ত এই সামঞ্জস্যের কারণেই এসব কাজে তাঁর আগ্রহ বা শখ ছিল।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১১৯)

২৬ হিজরী সনে মসজিদুল হারাম বা কাবা শরীফের সম্প্রসারণ হয়। ২৬ হিজরী সনে হযরত উসমান (রা.) হারামের সীমানা নুতনভাবে নির্ধারণ করেন এবং মসজিদুল হারাম তথা কাবা গৃহের সম্প্রসারণ করেন। আশপাশের বাড়িঘর ক্রয় করে মসজিদুল হারামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় তাদের বাড়িঘর বিক্রি করে দেয়, কিন্তু কিছু লোক নিজেদের বাড়িঘর বিক্রি করতে সম্মত হয় নি। হযরত উসমান (রা.) তাদের সম্মত করাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। পরিশেষে হযরত উসমান (রা.)-এর নির্দেশে সে সমস্ত বাড়ি ভেঙে ফেলা হয় এবং সেগুলোর মূল্য তিনি বায়তুল মালে জমা করিয়ে দেন। এতে তারা হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে হইচই আরম্ভ করে। তখন তিনি তাদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, তোমরা আমার বিরুদ্ধে কেন এই দুঃসাহস দেখাচ্ছ তা কি তোমরা জান? এই দুঃসাহসিকতার একমাত্র কারণ হলো আমার নম্রতা। হযরত উমর (রা.)ও তোমাদের সাথে এমনই আচরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা কোন হট্টগোল কর নি। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন খালেদ বিন উসায়েদ হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে এসব বিশৃঙখলাকারী লোকদের সম্পর্কে কথা বলেন, তখন তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

(তারিখে তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯২)

সর্বপ্রথম ইসলামী নৌবাহিনীর জাহাজ বা নৌবহর ২৮ হিজরী সনে হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে গঠন করা হয়। আমীর মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে সামুদ্রিক যুদ্ধ করেন। আমীর মুআবিয়া হযরত উমর (রা.)-এর কাছেও সামুদ্রিক যুদ্ধের অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অনুমতি দেন নি। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.) খলীফা নির্বাচিত হলে আমীর মুআবিয়া তাঁর কাছেও (এ বিষয়ে) বার বার উল্লেখ করেন এবং অনুমতি প্রার্থনা করেন। অবশেষে হযরত উসমান (রা.) অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন, তুমি নিজে লোকদের নির্বাচন করবে না আর তাদের মধ্যে লটারিও করবে না, বরং তাদেরকে (এতে যোগদান করা বা না করার বিষয়ে) অধিকার দিবে। যে স্বেচ্ছায় এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায় তাকে সাথে নিয়ে যাও এবং তাকে সাহায্য কর। অতঃপর আমীর মুআবিয়া এমনটিই করেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস (রা.)-কে নৌপ্রধান নিযুক্ত করেন। তিনি সমুদ্রে গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে ৫০টি যুদ্ধ করেন আর এই সকল যুদ্ধে মুসলমানদের কোন সৈনিক পানিতে ডুবে মারা যায় নি এবং কোন প্রকার ক্ষতিও হয় নি।

(তারিখে তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৭)

রেওয়ায়েত অনুসারে, চারিত্রিক দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য ছিল। হযরত আব্দুর রহমান বিন উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাঁর মেয়ের কাছে এমন সময় আসেন যখন তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, হে আমার কন্যা! আবু আব্দুল্লাহ্, অর্থাৎ উসমানের সাথে উত্তম আচরণ করবে। কেননা চারিত্রিক দিক থেকে তিনি আমার সাথে আমার সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য রাখেন।

(মাজমুয়ায়েয যোওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফোয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৫৮)

হযরত ইয়াহিয়া বিন আব্দুর রহমান বিন হাতেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে কোন বিষয়কে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা.)-এর চেয়ে উত্তম কাউকে দেখি নি,

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যদিও তিনি বেশি কথাবলা থেকে বিরত থাকতেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রুকাইয়্যা বিনতে মুহাম্মদ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিতহই, সম্ভবত এখানে হযরত রুকাইয়্যা এর স্থ লে হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) হবেন। কেননা রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত রুকাইয়্যা মৃত্যুবরণ করেছিলেন আর এর ৫ বছর পর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) মুসলমান হয়েছিলেন এবং মদিনায় এসেছিলেন। কাজেই এখানে হযরত উম্মে কুলসুমকে বুঝানো হয়েছে, কেননা তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৯ হিজরী সনে। যাহোক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যার সমীপে উপস্থিত হই, যিনি ছিলেন হযরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী আর তার হাতে ছিল চিরুনি। তিনি বলেন, এইমাত্র আল্লাহ্র রসুল (সা.) আমার কাছ থেকে গিয়েছেন আর আমি তাঁর মাথায় চিরুনি করেছি। তিনি (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আবু আব্দুল্লাহ্ হযরত উসমানকে তুমি কীরূপ দেখ? আমি নিবেদন করি, অতি উত্তম। তিনি (সা.) বলেন, তুমিও তার সাথে সম্মানপূর্ণ আচরণ করবে, কেননা তিনি আমার সাহাবীদের মাঝে চারিত্রিক দিক থেকে আমার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য রাখেন।

(মাজমুয়ায়েয যোওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফোয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ:৫৮)

হযরত উসমানের এই স্মৃতিচারণ এখানেই শেষ করছি। আজও আমি কয়েকজনের (গায়েবানা) জানাযা পড়াব, এখন তাদের বৃত্তান্ত তুলে ধরছি।

প্রথম জানাযা হলো আহমদ বখশ সাহেবের পুত্র মুবাশ্বের আহমদ রিঞ্জা সাহেবের, যিনি রাবওয়ার মুয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ ছিলেন। তিনি গত ১০ মার্চ ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ডেরা গাজী খান জেলার রিন্দা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন। ১৯৯০ সনে থারপার্কার থেকে মুয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে কাজ করা আরম্ভ করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে মুয়াল্লেম এবং ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। যেখানেই তাকে প্রেরণ করা হয়েছে সর্বদা লাব্বায়েক বলেছেন আর কখনো কোন ওযরআপত্তি উত্থাপন করেন নি। সর্বদা বিশ্বস্ততার সাথে জীবন উৎসর্গকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন। আপন-পর সবাই তার সম্পর্কে লিখেছে যে, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী, দোয়াগো, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, উত্তম দাঈ ইলাল্লাহ্, সুবক্তা, খুবই মিশুক, অতিথিপরায়ণ, প্রফুল্লচিত্ত এবং বিনয়ী মানুষ ছিলেন। সর্বদা বিনয়াবনত কণ্ঠে এবং মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে নগ্ন তরবারির রূপ ধারণ করতেন আর ততক্ষণ সেই সভা থেকে উঠতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির সংশোধন না করতেন। তিনি স্ত্রী ছাড়া দুই পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার ছোট ছেলে স্নেহের শাযেল আহমদ জামেয়া আহদীয়া রাবওয়ায় চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

পরবর্তী প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ হলো মুনীর আহমদ ফররুখ সাহেবের যিনি ইসলামাবাদ জেলার সাবেক আমীর ছিলেন। তিনি দীর্ঘ অসুস্থতার পর ০৯ মার্চ তারিখে কানাডায় ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম এক-নবমাংশের ওসীয়্যতকারী ছিলেন। প্রকৌশলী মুনীর ফররুখ সাহেবের দাদার নাম ছিল হযরত মুন্সী আহমদ বখশ সাহেব, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি কাদিয়ানে গিয়ে ১৯০৩ সনের সালানা জলসায় বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিল ডক্টর চৌধুরী আব্দুল আহাদ সাহেব, যিনি কৃষি বিষয়ে এম.এস.সি. এবং পি.এইচ.ডি. করেছিলেন। সে যুগে পি.এইচ.ডি. করা অনেক মেধাবী ছাত্রদের কাজ ছিল। যাহোক, তিনি পি.এইচ.ডি. করেন। তিনি কিছুকাল লায়েলপুর জামা'তের আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৪৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন আহমদী যুবকদের, বিশেষত বিজ্ঞানীদের, ধর্মসেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান জানান তখন তিনিও, অর্থাৎ ডক্টর সাহেব বা ফররুখ সাহেবের পিতাও ওয়াকফ করেন এবং সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পরিবারসহ কাদিয়ানে স্থানান্তরিত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে ফযলে ওমর রিসার্চ ইন্সটিটিউট পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হুযূর (রা.) তাকে ফযলে ওমর রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এর ডাইরেক্টর তথা পরিচালক নিযুক্ত করেন। এরই সাথে তালীমুল ইসলাম কলেজে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবেও তার নিযুক্তি হয়।

ফররুখ সাহেব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর প্রথম দিকে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার পর পাকিস্তান সরকারের অধীনে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগে রীতিমতো চাকরি আরম্ভ করেন। চাকরিকালে তিনি দেশের অনেক শহরে কাজ করেছেন। বহু দেশে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৯৭ সালে পাকিস্তান টেলিকমিউনিকেশন্স লিমিটেড এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন।

রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থানের সময় তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার জেলা কয়েদ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পেয়েছেন আর এটি ছিল ১৯৭৪ সালের সংকটময় সময়। যাহোক তখন তিনি কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ১৯৭৭ সালে ইসলামাবাদ-এ স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের পর বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ১৯৯০ সালে নায়েব আমীর-১ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এরপর যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তিনি জীবন উৎসর্গ করেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর সমীপে নিজেকে উপস্থাপন করলে তা গৃহীত হয়। এরপর ১৯৯৯ সালে তাকে ইসলামাবাদ শহর এবং জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাবওয়ায় তিনি যেসব কাজ করেছেন (তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো), ডাইরেক্ট ডায়ালিং সুযোগ সৃষ্টির জন্য ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অনেক কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। IAAAE-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগে তিনি বিশেষ পদে এবং সাধারণভাবেও খেদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। ১৯৯৬ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ফযলে ওমর ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসেবে তাকে নিযুক্ত করেন, যে পদে তিনি আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর যুগে রাবওয়ায় সালানা জলসার সময় বিদেশী মেহমানদের জন্য জলসার বক্তৃতামালা অনুবাদের কাজ যখন আরম্ভ হয় তখন আহমদী ইঞ্জিনিয়ারদের একটি টিম গঠন করা হয়েছিল আর তাতেও তিনি অনেক পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এই টিমের প্রধান ব্যবস্থাপক মুনির ফররুখ সাহেবই ছিলেন। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন ইংল্যান্ড হিজরত করেছিলেন তখন এখানে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসাতেও তিনি প্রতিবছর নিয়মিতভাবে আসতেন আর অনুবাদের দায়িত্ব তার ওপরই অর্পণ করা হতো, অর্থাৎ মানুষের কাছে অনুবাদ পৌঁছানোর দায়িত্ব। তিনি খুবই সুচারুরূপে উক্ত কাজ সম্পন্ন করতেন। অনেক পরিশ্রমের সাথে তিনি কাজ করতেন। তার এমারতের যুগে ইসলামাবাদেও জামা'তী নির্মাণ কাজ অনেক বেশি হয়েছে।

তার এক পুত্র বলেন, জামা'তী কাজে সন্তানদেরকে অধিকহারে অংশ নেওয়ার উপদেশ দিতেন। সরকারি চাকরি করা সত্ত্বেও জামা'তের সেবায় সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। কর্মক্ষেত্র থেকে সোজা জামা'তের অফিসে আসতেন এবং জামা'তী দায়িত্ব পালন করতেন। প্রতি বছর যুক্তরাজ্য জলসা সালানার জন্য বিশেষভাবে ছুটি বাঁচিয়ে রাখতেন। চাকরিকালে আহমদী হবার কারণে প্রত্যন্ত এলাকা, ডেরা ইসমাইল খান-এ তাকে বদলী করা হয় আর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো সাহেব বলেন, তাকে যেন পুনরায় ইসলামাবাদে কাজে না লাগানো হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন এবং পুনরায় ইসলামাবাদেই তাকে বদলী করা হয়। আর এরপর সেখান থেকে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে যাওয়ার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ লতীফ সাহেবের, যিনি রাওয়ালপিণ্ডি জেলার সাবেক আমীর ছিলেন। তিনি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৭৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ব্রিগেডিয়ার লতীফ সাহেব তার পিতার সাথে আনুমানিক ১৯৫৫ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ব্রিগেডিয়ার সাহেবের পিতা ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেছিলেন। এরপর তার পরিবারে ব্রিগেডিয়ার সাহেব একা-ই আহমদী ছিলেন, অর্থাৎ তার সন্তানরা ব্যতিরেকে। তিনি স্ত্রী, দু'জন পুত্র ও দু'কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন।

২০০০ সনে অবসর গ্রহণের পর তিনি তার পুরো সময় জামা'তের কাজে ব্যয় করেন। (তিনি) সেক্রেটারী উমুরে আম্মা এবং

শেষাংশ ২ পাতায়

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

৯ই জুন, ২০১৫

মসজিদ বায়তুস সালাম -এর গোড়াপত্তন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ সম্পর্কে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

* এক ভদ্রলোক জানান, হুযুর আনোয়ারের সত্তা অত্যন্ত ইতিবাচক বলে আমার মনে হয়েছে, তাঁর ব্যক্তিতে আমি প্রভাবিত হয়েছি। তিনি একজন শান্তি প্রিয় ব্যক্তি আর তাঁকে দেখে মনে হয় সকলের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যারা ইসলামকে ঘৃণা করে, তাদের এমন নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত নয়, কারো সম্পর্কে না জেনে ভ্রান্ত ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা অন্যায়।

এক ব্যক্তি বলেন, আমি হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছি।তাঁকে দেখে ইতিবাচক বলে মনে হয়। আর আমি এটাও জানিয়ে দিতে চাই যে, ইসলাম নিয়ে আমার কোনও সমস্যা ছিল না। আপনাদের আদর্শবাণী 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে-' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণী।

স্থানীয় হাসপাতালের প্রধান কার্যনির্বাহক নিজের অভিমত জানিয়ে বলেন, হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মনে হচ্ছে। তিনি মানুষের সঙ্গে ভীষণ নৈকট্য রাখেন বলে মনে হচ্ছে। তাঁর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত ইসলামী শিক্ষা সেই ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত যা গণমাধ্যমে দেখানো হয়। হুযুরের ভাষণের দুটি বিষয় আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। প্রথমত, এখানকার বাসিন্দা সমস্ত মুসলমান ও খৃষ্টানরা জার্মান বংশোদ্ভূত, তাদের কারো মধ্যে কোন তারতম্য নেই। দ্বিতীয়ত যতক্ষণ প্রথম অংশ অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না, ততক্ষণ দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক এবং তাঁর ইবাদত কোন উপকারে আসবে না।

জোসেফ মুহস নামে এক অতিথি বলেন, হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সম্ভ্রমপূর্ণ। আপনারা নিজেদের খলীফাকে অনেক সম্মান দেন, এটাকে আমাকে ভীষণ ভাল লাগে। হুযুরের যে কথাটি আমার পছন্দ হয়েছে তা হল 'এই জায়গাটি তো অবশ্যই সুন্দর, কিন্তু আপনারা নিজেরাও সুন্দর মানুষ হয়ে এই এলাকাকে প্রকৃত সুন্দর করে তুলুন এবং এখানকার জন্য কল্যাণকর হোন।

ব্রিগিট সাহেবা নামে ভদ্রমহিলা বলেন, হুযুর অনেকটা পোপের মতই, অর্থাৎ ধর্মীয় নেতার মত। তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি ও আকর্ষণ রয়েছে আর তাঁকে দেখে মনে হয় খোদা তা'লার সঙ্গে তাঁর এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যই প্রকৃত সৌন্দর্য- তাঁর এই উক্তি আমার পছন্দ হয়েছে।

শহরের ইন্টিগ্রেশন অফিসে সদস্যা ইরবিল ইরেন সাহেবা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন- এই অনুষ্ঠান সফল অনুষ্ঠান ছিল। আজ আমি জেনেছি যে করমর্দন না করা সত্ত্বেও সমাজের উন্নতির জন্য নৈতিকভাবে হাতে হাত রেখে চলার প্রয়োজন। হুযুর আনোয়ার অত্যন্ত সহানুভূতিশীল বলে মনে হয়। তাঁর কথাগুলি উচ্চাঙ্গের ছিল, বিশেষ করে অভ্যন্তরীন সৌন্দর্যের বিষয়ে তাঁর মন্তব্যটি।

একজন মহিলা পুলিশকর্মীও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের মতামত জানিয়ে বলেন,

'একটি বিষয় আমার ভাল লেগেছে, আমি দেখেছি হুযুর আনোয়ার সেখানে বসে বসে অন্যান্য বক্তাদের কথাগুলি নোট করছিলেন আর সেই কথাগুলিকে তিনি নিজের ভাষণেও উদ্ধৃত করেছেন। বক্তাদের কথাগুলি নোট করে তিনি সেগুলিকেই ইসলামের আকর্ষনীয় শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বর্ণনা করেছেন। এটিই তো প্রকৃত সমন্বয়।

মহিলা পুলিশকর্মী বলেন, 'যে ইসলামকে আমরা পুলিশকর্মীরা দেখি, তাতে উগ্রবাদ ও হিংসা পাওয়া যায়। কিন্তু আমি খলীফাতুল মসীহ বর্ণিত ইসলাম সম্পর্কে শুনেছি আর এটিই যদি ইসলাম হয়ে থাকে, যা খলীফাতুল মসীহ্ উপস্থাপন করেছেন, তবে এই ইসলাম অবশ্যই দ্রুত বিস্তার লাভ করবে আর এই ইসলামের বিরুদ্ধে কোন মানুষের মনে কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

পাইরেটস পার্টির এক প্রভাবশালী ও প্রবীণ সদস্য তিনি ভাষণ শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর চেহারায় এক বিশেষ প্রশান্তি ও তৃপ্তির আভাস লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বক্তব্য উচ্চমানের ছিল।

এক ভদ্রলোক ওল্ড হোম এ থাকেন, তিনি তুর্কির জামাতের সঙ্গে পরিচিত। তিনি বলেন, তুর্কিরা জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে সব সময় সংরক্ষনশীল মনোভাব প্রকাশ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানে যোগ দান করেছে এবং খলীফার ভাষণ শুনেছে। আমি ভাষণ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। 'আমাদের সকলে মিলে মানবতার কারণে এক জাতি হিসেবে কাজ করতে হবে'- তাঁর এই বক্তব্য আমার পছন্দ হয়েছে।

এক পার্টি সদস্য বলেন, যেভাবে এখানে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ হয়েছে, আমাদের দলে বড় পেশাদাররাও এমন অসাধারণ কাজ করতে পারে না।

Vechta শহরে মসজিদ বায়তুল কাদির এর উদ্বোধন

জার্মানীর আমীর সাহেবের বক্তব্য

জার্মানীর আমীর সাহেব নিজের পরিচিতি জ্ঞাপনমূলক বক্তৃতায় বলেন-

এই শহরটি প্রান্তীয় **Niedersachsen** প্রদেশের পশ্চিমে অবস্থিত যার জনসংখ্যা ৩ হাজার। আর এটি **Vechta** জেলার বৃহত্তম শহর। শহরের ইতিহাস একাদশ শতাব্দীতে গিয়ে মিশেছে, যখন উত্তর জার্মানীর সেই পথগুলির একটিতে দুর্গ নির্মাণ করা হয়, যেগুলি জার্মানীর মুখ্য প্রবেশ পথ। দুর্গের আশপাশে মানুষ এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে শত্রুদের কয়েকটি হানা ও ত্রিশ বছরের যুদ্ধ এবং এছাড়া একবারের ব্যপক অগ্নিকাণ্ড শহরের বিরাট অংশকে ধ্বংস করে দেয়। তা সত্ত্বেও শহরের বাসিন্দারা শহরের পুনর্নির্মাণ করে।

শহরটি অশ্বরোহণের দিক থেকে বেশ খ্যাতনামা। এছাড়া লোকমেলার জন্যও প্রসিদ্ধ যা ১৯২৪ সাল থেকে প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

এই শহরে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৬সালে। মাননীয় লাঈক আহমদ মুনীর সাহেব মুবাল্লিগ সিলসিলা এখানে আসার পর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভে জামাতের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র সাতজন। জামাতটি বেশ সক্রিয় হিসেবে পরিচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন এটি বেশ সুদৃঢ় ও সক্রিয় জামাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জনকল্যাণমূলক কাজ ও বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে জামাত অনেক কাজ করেছে। জামাতটি তবলীগি অনুষ্ঠান, তবলীগি বৈঠকের আয়োজন এবং বুক স্টল লাগানোর বিষয়ে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে।

মসজিদের জমিটি ২০১০ সালে ক্রয় করা হয়েছিল, যার আয়তন ১৯৯৮ বর্গমিটার আর এর মূল্য ৫৫ হাজার ইউরো।

২০১১ সালের ১১ই অক্টোবর হুযুর আনোয়ার মসজিদটির গোড়াপত্তন করেছিলেন। ২০১৩ সালের ৩রা অক্টোবর এখানে নির্মাণ কার্য শুরু হয়। মসজিদের দুটি হলঘর আছে আর ছাদবিশিষ্ট অংশের আয়তন হল ২৫৭ বর্গমিটার। মসজিদের মিনারের উচ্চতা ৯মিটার আর গম্বুজের ব্যস ৬ মিটার। এখানে ১২টি গাড়ি পার্কিং করার ব্যবস্থা আছে আজ ৯ই জুন মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে।

অমুসলিম জার্মান অতিথিদের ভাষণ

জার্মানীর আমীর সাহেব ভাষণ দেওয়ার পর ডেপুটি মেয়র ক্লজ ডালিংহস নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন-

'সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করার করার জন্য। আমি এজন্যও কৃতজ্ঞ যে **Vechta** শহরের উল্লেখ খুব আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে করা হয়েছে। মসজিদের উদ্বোধন আপনাদের এবং আমাদের উভয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর এই উপলক্ষ্যে আমি শহরের প্রবন্ধকদের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

আহমদীয়া মুসলিম জ মাত **Vechta**-এর জন্য এই মসজিদ

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ২১)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি কেবল মিলনস্থল নয়, বরং এটি এমন এক প্রতীক যার দ্বারা প্রকাশ পায় যে ইসলাম সেভাবেই এই সমাজের অংশ যেভাবে অন্যান্য ধর্মের মানুষ এই শহরের অংশ।

ভদ্রলোক বলেন, এখানে জামাত আহমদীয়ার মসজিদ নির্মাণ হওয়ায় এখন **Vechta** শহর জামাতের স্বদেশ হয়ে উঠেছে। একটি স্থান যখন মানুষের দেশের মর্যাদা পায় তখন সে সেই স্থানের সঙ্গে একীভূতও হয়। এর দ্বারা আমি বোঝাতে চাইছি যে, সকলকে গ্রহণ করে মিলে মিশে থাকা উচিত এবং কারো প্রতি ঘৃণাভাব প্রকাশ করা উচিত নয়।

ভদ্রলোক বলেন, জামাত আহমদীয়ার বৈশিষ্ট্য হল তারা সত্যিকার অর্থেও সেই কাজ করে দেখায়, সকলের সঙ্গে স্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করে।

সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আপনি নিরাপদের ফিরে যান এই কামনাই করি আর অবশ্যই পুনরায় তিনি আমাদের মাঝে আসবেন। সবশেষে আমি খলীফাতুল মসীহকে সাম্মানিক হিসেবে একটি স্মারক প্রদান করতে চাই। মেয়র সাহেব **Vechta** শহর সংক্রান্ত একটি স্মারক উপস্থাপন করেন।

মেয়রের ভাষণের পর প্রাদেশিক সংসদ সদস্য স্টিফেন সিমার সাহেব বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, 'সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! সর্বপ্রথম আমি আপনাকে মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি প্রাদেশিক সাংসদের একজন সদস্য আর আমি জামাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করে থাকি। আজ **Vechta** শহরে আপনাদের কাজ, পরিশ্রমের ফল পাচ্ছেন মসজিদ হিসেবে। এখন আপনারা নিজেদের ধর্ম অনুসারে এই মসজিদে ইবাদত করতে পারবেন।

আপনারা আমন্ত্রন পত্রে শান্তি, নিরাপত্তা, পারস্পরিক সংলাপকে উৎসাহ দান, মানবতার সহায়তা ও সেবার প্রেরণা উপস্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে আমি বলতে চাই যে, এই এলাকায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস। প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক বহু মানুষ এখানে বাস করেন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মে অনেক রকম সমস্যা দেখা যায়। অনুরূপভাবে যে ধর্ম একে অপরের কাছাকাছি থাকে, তাদের মধ্যেও সমস্যা দেখা দেয়।

একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা খুব জরুরী। প্রত্যেক ধর্মের মানুষ নিজের নিজের ধর্মপন্থা হিসেবে বসবাস করুক, পরস্পরের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে থাকুক- এটা খুব জরুরী।

আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যেন সেই যুগের পুনরাবৃত্তি না হয় যেখানে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। কেননা জার্মানীতে এমন যুগ গেছে, যখন অনবরত যুদ্ধ চলতে থেকেছে।' সবশেষে ভদ্রলোক পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তাঁকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করার জন্য।

মসজিদ বায়তুল কাদির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন:

'সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সর্বপ্রথম আমি আগত সকল অতিথিকে আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যে অনুষ্ঠানটি কিনা সম্পূর্ণরূপে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং তাদের উপাসনাগারের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। এটি অবশ্যই আপনাদের উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয়। আপনারা আহমদী নন, তাসত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানে এসেছেন। শুধু তাই নয়, আমি এজন্যও আপনাদের প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ যে আপনাদেরকে ব্যবস্থাপগণ সাড়ে পাঁচটার সময় দিয়েছিল। কিন্তু আমার যাত্রাকালে বিলম্বের কারণে আপনাদেরকে অপেক্ষা করতে হল। আমরা দীর্ঘ সফর করে এসেছি, এছাড়া পথিমধ্যে এখান থেকে আড়াই কিমি দূরে আরও একটি শহরে একটি মসজিদের ভিত্তি রেখেছি। সেখানে অনুষ্ঠান হওয়ার পর আমরা রওনা হয়েছি। স্বাভাবিক কারণেই দীর্ঘ সফর, রাস্তায় যানজট, তার উপর অন্য একটি অনুষ্ঠানের কারণে বিলম্ব হয়েছে। এই জন্য আমি সর্বপ্রথম আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এর পরেও আপনারা দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করেছেন, এটাই অনেক বড় বিষয়।

আর আমি এজন্যও কৃতজ্ঞ যে, আমি সেই নবী (সা.)-এর মান্যকারী, যিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনা। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাও আমার ইবাদতের অংশ। মসজিদে গিয়ে নামায পড়লে আমার কোন উপকার হবে না, যদি আমি মানুষের সৎ আবেগ অনুভূতির বিষয়ে যত্নবান না হই, আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ না হই। এই জন্য আমি সর্বপ্রথম আপনাদের ধন্যবাদ জানাই যে, আপনারা এখানে বসে থেকেছেন। আপনাদেরকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে ক্ষমা প্রার্থনাও করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের মতে মসজিদ হল খোদা তা'লার ঘর, আর প্রত্যেক উপাসনা স্থলই খোদা তা'লার ঘর হয়ে থাকে। মক্কার কাফেররা আঁ হযরত (সা.) হিজরত করে মদীনা যাওয়ার পর তাঁর উপর যখন আক্রমণ করে বসে, সেই সময় মুসলমানদের কাছে কোন যুদ্ধাস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ছিল না। তখন মুসলমানদেরকে আদেশ করা হয় যে তোমরা অনেক সহ্য করেছ, তেরো বছর পর্যন্ত ধৈর্য ধরেছ, এখন শত্রুদেরকে প্রতিহত করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু সেই কঠোরতা কি কেবল মুসলমানদেরকে রক্ষার জন্যই ছিল? না, কঠোর হও এজন্য যে আজ যদি তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন না করা হয়, তবে ধর্মের এই বিরোধীরা, যারা খোদার ঘরকে আবাদ দেখতে চয় না, যারা চায় না যে মানুষ কোন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকুক এবং তাদের উপাসনাগারকে আবাদ রাখুক- তারা এগুলিকে ধ্বংস করে ফেলবে। এই জন্য কুরআন করীমে স্পষ্ট লেখা আছে যে যদি তাদেরকে বাধা না দাও, তবে কোন চার্চ, সীনাগগ, কোন উপাসনাগার কিম্বা মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কেবল নিজেদের মসজিদকেই রক্ষা করলেল হবে না, বরং প্রত্যেক ধর্মের উপাসনাগারকে রক্ষা করতে হবে। চার্চের পবিত্রতাও যেমন রক্ষা করতে হবে,তেমনি সিনাগগ, অন্যান্য মন্দির ও উপাসনাগারের পবিত্রতাও রক্ষা করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই শিক্ষা মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি আমাদের জন্য একটি কর্মসূচিও বটে। কাজেই এ বিষয়টি সামনে রেখে আমরা মসজিদ নির্মাণ করি আর এটিকে সামনে রেখে আমরা সমস্ত ধর্মের অনুসারীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করি, তাদের ধর্মগুরুদের সম্মান করি। এমনকি আমরা এও মনে করি যে এটি ছাড়া আমাদের ইবাদত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর কেবল সম্মান প্রদর্শন করাই নয়, বরং আমাদেরকে যদি অন্য কোন ধর্মের লোকেরা তাদের উপাসনাগার রক্ষার জন্য আহ্বান করে, সেক্ষেত্রেও জামাত আহমদীয়া মুসলেমা এর জন্য প্রস্তুত আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদত করারই আদেশ দিয়েছেন। কুরআন করীমের অসংখ্য স্থানে এই আদেশ আছে যে তাকওয়া অবলম্বন কর। তাকওয়া কি? তাকওয়া হল খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে একদিকে যেমন তাঁর ইবাদত করতে হবে, অপরদিকে তাঁর সৃষ্ট জীবের অধিকারও প্রদান করতে হবে। অহংকার ও আমিত্ব বর্জন কর। বিনয় অবলম্বন কর, বিনয়সহকারে আপনজনদের, নিজ ভাইয়েদের, স্বজাতি এবং সমগ্র মানবজাতির সেবা কর। আমরা যারা মসজিদে আসি, তাদের এই সব নির্দেশ পালন করা কর্তব্য। যদি এই নির্দেশগুলি পালিত হয় তবেই খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ হবে এবং সঠিক অর্থে ইবাদত হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার সামনে যারা বসে আছেন, তাদের অধিকাংশই আহমদী নন। বরং আমার সামনে যে মুখগুলি আমি দেখতে পাচ্ছি, তাদের হয়তো মাত্র ১০ শতাংশ আহমদী। বাইরে নিশ্চয় অনেকে আছেন যারা আমার কথা শুনছেন, কিন্তু আমার সামনে অধিকাংশই স্থানীয় মানুষ বসে আছেন। এটি প্রমাণ করছে যে আহমদীদের সঙ্গে আপনাদের সুসম্পর্ক আছে আর এই মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর, যার উদ্দেশ্যই হল এই সম্পর্ককে আরও গভীর করা এবং মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা- আশা করা যায় সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এখানকার আহমদীরা আরও বেশি সচেষ্ট হবে। ইনশাআল্লাহ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা, যাঁকে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী বলে বিশ্বাস করি, তিনি বলেছেন- আমি মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। আমার মান্যকারীরা যদি এই দুটি উদ্দেশ্যকে পূর্ণ না করে, তবে তারা যেন আমার জামাতে সামিল না হয়। তোমাদের আহমদী হিসেবে পরিচয় দেওয়া কোন উপকারে আসবে না। তখন তোমরা সেভাবেই উগ্রবাদী হয়ে থাকবে, যেভাবে অন্যান্য সংগঠনগুলিকে আমরা দেখতে পাই। আর সেই উদ্দেশ্য দুটি হল-

তিনি বলেছেন, 'প্রথম যে উদ্দেশ্যটি নিয়ে আমি এসেছি, সেটি হল মানুষকে তার স্রষ্টার নিকটবর্তী

করা এবং সঠিক ইবাদতকারীতে পরিণত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল মানুষকে পরস্পরের অধিকার প্রদান করার প্রতি মনোযোগী করা। কাজেই জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে এই দুটি প্রধান উদ্দেশ্য। আর এই দুটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর প্রতিটি শহর ও প্রতিটি প্রান্তে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আর এজন্যই আমাদের মসজিদগুলিও এজন্যই তৈরী করা হয়।

এই কারণেই আফ্রিকা এবং অন্যান্য নির্ধন দেশগুলিতে আমরা মানব সেবার কাজ করার চেষ্টা করছি। আমরা কেবল একটি ধর্মীয় জামাত হওয়ার দাবিই পূর্ণ করছি না, কেবল নিজেদের ইবাদতের বিষয়েই মনোযোগী হচ্ছি না, বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের স্কুলও চলছে এবং কোন ভেদাভেদ ছাড়াই দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এমনকি কয়েকটি দেশে আমাদের বহু স্কুল এমন আছে যেখানে আহমদী তো দূরের কথা কোনও মুসলমান ছাত্রও নেই- সেখানে খৃষ্টান এবং সেই লোকেদের সন্তানরা শিক্ষালাভ করে যারা কোন ধর্ম মানে না। আমরা তাদেরকে কোন ভেদাভেদ ছাড়াই শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছি। সেখানে প্রাথমিক স্কুল ও মাধ্যমিক স্কুল উভয়ই আছে।

এছাড়াও আমাদের একাধিক হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রও রয়েছে যেগুলি মানবতার সেবায় নিয়োজিত আছে। অনুরূপভাবে কোন ভেদাভেদ ছাড়া আফ্রিকার প্রত্যন্ত দেশগুলিতে আমরা পানি সরবরাহ করার চেষ্টা করছি। এখানে হোটেলের ওয়াশরুমে লেখা থাকে যে পানি কম ব্যবহার করবেন। পানি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু, তাসত্ত্বেও জলের অপচয় করা হয়। আপনারা বাড়িতে এবিষয়টি অনুভব করেন না, জলের ট্যাপ খুললেই জল পেয়ে যান। কিন্তু আফ্রিকার চিত্রটি এমন নয়। আমি সেখানে আট বছর কাটিয়েছি, আমার জানা আছে যে সেখানকার মানুষ জলের জন্য কেমন হাহাকার করে। আপনার সাত -আট বছরের সন্তানের সঠিক আহার, পুষ্টি এবং ভাল শিক্ষার বিষয়ে আপনি যখন চিন্তিত থাকেন, সেখানে সেই সব শিশুরা মাথায় বালতি নিয়ে দুই-তিন কিমি দূরের কোন এক নোংরা পুকুর থেকে বৃষ্টির জল বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসে। এমতাবস্থায় জামাত আহমদীয়া এ চেষ্টাও করছে যাতে তাদের বাড়ির কাছে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়। আর সেই পানি যা বালতিতে করে নিয়ে আসা হয় এতটাই নোংরা যা দেখে আপনারা হয়তো হাত ডোবাতেও চাইবেন না। কিন্তু তারা অগত্যা সেই পানি পান করে। জামাত আহমদীয়া তাদের জন্য পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি প্রকল্পের সূচনা করেছে, পাম্পও বসিয়েছে। ইউএন যে কয়েকটি পাম্প বসিয়েছিল, তার অনেকগুলিই খারাপ হয়ে গেছে। সেগুলির খোঁজ খবর নেওয়ার মতও কেউ ছিল না। সেগুলিকে পুনরায় বসানোও হয়েছে যাতে মানুষকে পরিষ্কার পানি সরবরাহ করা যায়। এই পাম্পগুলি বসার পর যখন তা থেকে পরিস্কার পানি বের হয়, তখন তা দেখে সেখানকার মহিলা ও শিশুদের চোখে মুখে যে আনন্দ ফুটে ওঠে তা দেখার মত। কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য পরিস্কার জলের ব্যবস্থা করলেন আর তারা চার কিমি হেঁটে বালতিতে করে পানি বয়ে আনার হাত থেকে রক্ষা পেল- সে কথা চিন্তা করে তারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। কাজেই জামাত আহমদীয়া মানবতার সেবার জন্যই এই সমস্ত কাজ করছে।

অনুরূপভাবে জামাত আহমদীয়া আদর্শগ্রাম প্রকল্পও পরিচালনা করছে, যার অধীনে সেখানকার গ্রামবাসীদের জন্য স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা করা হয়। কমিউনিটি হল তৈরী করা হয় এবং গ্রীন হাউস তৈরী করে স্থানীয়ভাবে কিছুমাত্রায় শাকসবজি চাষের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্পও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটি কোন নির্দিষ্ট স্থানের জন্য হচ্ছে না, সর্বত্র এবং যে ধর্মের মানুষের মানুষই হোক না কেন, সকলের জন্যই এই প্রকল্প চলছে। কাজেই মানবতার সেবা একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা জামাত করে চলেছে।

অনেক চার্চও এই কাজ করে থাকে এবং তা অত্যন্ত ব্যাপক আকারেও করে থাকে। কিন্তু জামাত আহমদীয়ার বিশেষত্ব হল, যেমনটি আপনারা এখানে দেখলেন যে এই মসজিদটি স্বেচ্ছাসেবকরা তৈরী করেছে এবং অনেক কাজ তারা নিজেদের হাতেই করেছে। এখানে ইউরোপ থেকে এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষিত যুবক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নিজেদের খরচে আসে। আর যারা এখানে নিজেদের গাড়িতে সফর করে, যারা ইউরোপের শহরে বাস করে, যারা এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়া সময় নিজের গাড়ি ছাড়া যাওয়ার কথা হয়তো ভাবতে পারে না বা যারা পাকা রাস্তা ছাড়া চলতে পারে না, তারাই সেখানে গিয়ে কাঁচা রাস্তায় অনেক সময় মোটর সাইকেলে বসে অনেক সময় সাইকেলে করে যায় এবং সেবার কাজ করে। কেউ চার সপ্তাহের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করে, কেউ আবার আট সপ্তাহের জন্য। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই সেবামুলক কাজগুলি জামাত আহমদীয়া করে চলেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই কাজগুলি জামাত আহমদীয়ার আর এগুলি সেই কাজ যার জন্য জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর সর্বত্র বার্তা দেয় আর আমি আশা করি, আপনারা নিশ্চয় এইসব কথাগুলিই জেনেছেন এবং আহমদীদের দ্বারা এগুলির প্রতিফলন ঘটেছে। সেই কারণেই আহমদীদের সঙ্গে আপনাদের এমন সখ্যতা রয়েছে, যার কারণে আমি এখানে অনেক স্থানীয় লোকেদের দেখতে পাচ্ছি, যাদের ধর্মীয়ভাবে জামাতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তাসত্ত্বেও আমাদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর প্রতিদানও দিন।

আমাদের আমীর সাহেব একটি কথা বলেছেন যে, এই শহরে পুত্র সন্তান জন্মের হার বেশি। এদিক থেকে শহরের বিশেষ খ্যাতি আছে। এর পরে অনুবাদক যে অনুবাদ করেছিল তার অর্থ ছিল- এই কাজই জামাতে আহমদীয়া করে থাকে। তাই আমি জানি না এর দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি যদি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সন্তান জন্ম দেওয়ার কাজ জামাতে আহমদীয়া করে থাকে, তবে সেও ভাল কথা। আল্লাহ্ তা'লা জামাত আহমদীয়ার সদস্যদেরকে বেশি করে পুত্র সন্তান দান করুন যাতে পরবর্তীতে তারা সঠিক অর্থে শিক্ষা লাভ করে এই শহরের জন্য আরও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে। কাজেই ভবিষ্যত প্রজন্মে পুণ্যকর্মসমূহের ধারা অব্যাহত রাখাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার প্রতি জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা অনেক বেশি মনোযোগ দেয় এবং দেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের ন্যাশনাল আমীর সাহেব মসজিদের গুণাবলী বর্ণনা করার সময় একটি কথা বলেছেন। সেই কথাটি হল, এই মসজিদটি পাথর দিয়ে তৈরী। প্রথমত পাথরের বাহ্যিক সৌন্দর্য রয়েছে, কিন্তু পাথরের খারাপ দৃষ্টান্তও রয়েছে। আমাদের ভাষায় একটি উপমা দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি অপরের আবেগ অনুভূতির প্রতি যত্নবান নয়, যে অপরের কথা বোঝার চেষ্টা করে না, সেই পাষাণ হৃদয় হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআন করীম আমাদেরকে আরও একটি উপমাও দিয়েছে। কিছু মানুষ পাষাণ হৃদয় হয়ে থাকে, কিছু মানুষ আবার তেমনটি হয় না। কেউ আবার পাথরের থেকেও বেশি কঠিন হৃদয় হয়ে থাকে। এমনকি কিছু কিছু পাথরের মধ্য থেকে প্রস্রবণ নির্গত হয়। তাই আশা করি জামাত আহমদীয়ার যে সব সদস্যরা এই মসজিদে ইবাদত করতে আসবে, পাথর নির্মিত মসজিদ দেখে তাদের হৃদয় পাথরের মত কঠোর হয়ে যাবে না বরং সেই সব পাথরের মত হবে, যার মধ্য থেকে প্রস্রবন নির্গত হয়। আর এখানে আগমণকারী প্রত্যেকে যারা ইবাদত করবে, তাদের হৃদয় এমন হয়ে যাবে, যার মধ্য থেকে অপরের জন্য স্নেহ ও ভালবাসার প্রস্রবণ উৎসারিত হবে। আর এটিই আমাদের উদ্দেশ্য, এভাবেই আমরা পৃথিবীতে ভালবাসার প্রসার করব। তখনই আমরা এই নারাধ্বনিকে স্বার্থক করতে পারব যেখানে আমরা বলি ' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে।' এটি জামাতে আহমদীয়ার অনেক বড় দায়িত্ব আর আমি আশা করি আহমদীরা এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবে। আর এই শহরের নাগরিকদের উদ্দেশ্যেও আমি একথাই বলব যে, আপনারা যদি দেখেন এই কর্তব্য পালিত হচ্ছে না, তবে আমাকে অবশ্যই জানাবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, দ্বিতীয়ত সহকারি মেয়র সাহেব এখানকার মসজিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এবং নিজের ভাবাবেগ ব্যক্ত করেছেন। আমি তাঁকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের যে প্রত্যাশার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন, বা যেটিকে তিনি ইসলামের প্রকৃত আত্মা বলে ধারণা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 29 Apr, 2021 Issue No.17

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করতেন, মসজিদ তৈরী হওয়ার পর আহমদী মুসলমানদের আচরণে এবং তাদের প্রতিটি কার্যকলাপে তা সেই প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি প্রকাশ পাবে। ইনশাআল্লাহ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইন্টিগ্রেশন বা সমন্বয় নিয়ে কথা হচ্ছে। আমার দৃষ্টিতে কেবল বাহ্যিক মেলামেশা মানেই সমন্বয় নয়। প্রকৃত সমন্বয় তখনই হয় যখন এখানে বসতিস্থাপনকারী আহমদী, যারা অন্যান্য দেশ থেকে এখানে এসে জার্মানীর নাগরিকত্বও লাভ করেছে, সেই সমস্ত নাগরিক সুবিধাও লাভ করছে যা একজন জার্মান নাগরিক পেয়ে থাকে- তাদের ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করছে- তাই প্রকৃত সমন্বয় হল এখন এই দেশের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা, আর এটিই তাদের ঈমানের অঙ্গ। যদি তারা পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা না দেখায়, দেশের উন্নতিতে যোগ দান না করে, এখানকার সমাজের উন্নতির জন্য নিজেদের চিন্তাধারা, বিবেকবুদ্ধি এবং সকল শক্তিবৃত্তিকে কাজে না লাগায়,তবে এর অর্থ হবে এরা সঠিক অর্থে সমন্বিত হচ্ছে না, আর নিজেদের ঈমানের দাবি পূর্ণ করছে না। কেননা আমাদের নবী করীম (সা.) এ কথাও বলেছেন যে দেশের প্রতি ভালবাসা তোমাদের ঈমানের অঙ্গ। আমার ধারণা, এগুলি আহমদীদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় বলেই এমন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও ভাল দৃশ্য পরিলক্ষিত হবে। ইনশাআল্লাহ॥

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাঁর একটি কথা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। তিনি বলেছেন, পরস্পরের ভাবাবেগরে বিষয়ে সংবেদনশীল থাকা বাঞ্ছনীয়। এখানে আসার পথে যেখানে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রেখে আসলাম, সেখানেও আমি বলেছিলাম যে যদি পরস্পরের আবেগ অনুভূতির বিষয়ে যত্নবান থাকেন, সচেতন থাকেন, তবেই আমরা প্রকৃত অর্থে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করতে পারি এবং এক সুন্দর সমাজ গঠন করতে পারি। আর মানুষ যেন পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারে, সে জন্যই তো ধর্ম। কুরআন করীমের নির্দেশ হল ধর্ম তোমাদের অন্তরের বিষয়। যার যে ধর্ম পছন্দ, সেটিই গ্রহণ কর কিন্তু মানবীয় মূল্যবোধ সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখ। পরস্পরের আবেগ অনুভূতির প্রতি সচেতন থাক। এগুলি না করলে তুমি ভাল মানুষ নও, আর যদি ভাল মানুষ না হও তবে সঠিক অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতও করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তিনি আমাকে যে উপহার দিয়েছেন, তার জন্যও ধন্যবাদ জানাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়া এম.পি সাহেবও কয়েকটি কথা বলেছেন। পারস্পরিক ভেদাভেদ নিয়ে তিনি একটি কথা বলেছেন এবং এখানকার ভেদাভেদের ইতিহাস সম্পর্কে বলেছেন। তবে একথাও বলেছেন একটি গীর্জায় দুটি ভিন্ন ফির্কা একত্রে উপাসনাও করে। তাই এটি অনেক বড় গুণ আর যেমনটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যদি পরস্পরের আবেগ অনুভূতির প্রতি যত্নবান থাকেন, তবে আমাদের সৃষ্টিকর্তা সেই এক খোদার ইবাদতের জন্য নির্মিত উপাসনাগারও একে অপরকে ব্যবহার করতে দিতে পারবেন এবং সেখানে একত্রে ইবাদতও করতে পারবেন। প্রত্যেকটি ধর্মই শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই ধর্মগুলিকে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা আমাদেরকে এ কথাই বলেছেন যে ধর্মে বিকার দেখা দিয়েছে। আমি পুনরায় তাদেরকে ভালবাসার শিক্ষা দিতে এসেছি। এরপর তিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে আমাকে মান্য করে, এই ভালবাসা ও সম্প্রীতির শিক্ষা এবং মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখাই তার কর্তব্য। তবেই তোমরা সঠিক অর্থে খোদা তা'লার ইবাদত করতে পারবে এবং মসজিদের অধিকার প্রদান করতে পারবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ পৃথিবীর প্রয়োজন শান্তির। পৃথিবীতে প্রবল কলহ তৈরী হয়েছে। কেবল যে মধ্যপ্রাচ্যেই বা কয়েকটি আরব দেশেই অরাজকতা চলছে কিম্বা পূর্ব ইউরোপেই অরাজকতা রয়েছে- এমনটি বলা যাবে না। ছোট আকারের অরাজকতা ক্রমশ বড় হতে হতে গোটা বিশ্বকে ঘিরে ফেলবে। অতীতের যুদ্ধসমূহের ইতিহাস থেকে আমরা এই চিত্রই দেখেছি। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যে, পৃথিবীতে যে কলহ বিবাদ ছড়িয়ে আছে তা যেন প্রতিহত করে শান্তি ও সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষার প্রসার করি এবং কর্মধারার মাধ্যমে একে অপরের সহায়তা করার চেষ্টা করি। যাতে একদিকে যেমন আমরা একে অপরকে নিরাপত্তাদানকারী হব, তেমনি অপরদিকে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকেও সুরক্ষিত রাখতে পারব। ভবিষ্যত প্রজন্ম যদি আমাদের বেপরোয়া মনোবৃত্তির কারণে যুদ্ধের কবলে পড়ে তবে প্রজন্ম পরম্পরায় তার ভয়াবহ পরিণাম প্রকাশ পাবে আর তারা আমাদেরকেই দোষারোপ করবে। তাই আজ আমাদেরকে প্রেম ও সম্প্রীতির বাণী প্রসার করার দরকার, যার জন্য আমাদেরকে পূর্বের থেকে অনেক বেশি চেষ্টা করতে হবে। আর আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেন এর চেষ্টা করার তৌফিক দান করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সেই সঙ্গে আমি আহমদীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকি। আমি পুনরায় আহমদীদের উদ্দেশ্য বলছি, এখন এই মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর আপনাদের উপর মানুষের দৃষ্টি অনেক বেশি নিবদ্ধ হবে। তাই আগের থেকে বেশি পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। সঠিক অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করুন এবং মসজিদ তৈরী হওয়ার পর আশপাশের পরিবেশে অধিকারও প্রদান করুন, নিজ প্রতিবেশিদের প্রাপ্য অধিকারটুকু দিন। মানবতার সেবাও অব্যাহত রাখুন এবং এই শহরেও এবং নিজেদের প্রতিবেশীদের মধ্যে আগের চেয়ে বেশি ভালবাসার বাণী ছড়িয়ে দিন।

(এরপর ২ পাতায়....)

(১ম পাতার শেষাংশ...)

সামঞ্জস্যহীনতাকেই প্রকাশ করে। এমন পুস্তকের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে কুরআন করীমের উপর আপত্তি করা আশ্চর্যের। অবশ্যই আমরা ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বাইবেলের কতিপয় বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি, কিন্তু তা তখনই, যখন যৌক্তিক দিক থেকে এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ কিম্বা কুরআন করীমের সঙ্গে সেগুলি সমন্বয়পূর্ণ হয়। অন্যথায় বাইবেলের মধ্যে এত বেশি মানবীয় হস্তক্ষেপ ঘটেছে যে এর ইতিহাস পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে বলে দাবি করা যেতে পারে না। এমতাবস্থায় বাইবেলের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কুরআন করীমের উপর আপত্তি করা যায় না, যার মধ্যে বর্ণিত ইহুদীদের ইতিহাস সম্পর্কে ঘটনাবলী বর্তমানে গবেষণার মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে। অথচ, ইহুদী ইতিহাসের বর্ণনাগুলি ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। যেমন হারুন দ্বারা বাছুরের উপাসনা করা, মুসার ফেরাউনের মরদেহকে সংরক্ষন করা ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা যদি এবিষয়ে তওরাতের বর্ণনাকে সঠিক বলে ধরে নিই তবে কোন আপত্তি ওঠে না। কারণ কুরআন করীম 'কাবিরাহুম' ঘোষণা দিয়েছে, আকবারুহুম বলে নি। বারো জন পুত্র সন্তানের মধ্যে চতুর্থ সন্তানকেও কবীর বলা যেতে পারে। কেননা কবীর এর অর্থ কেবল বড় হওয়া, সব থেকে বড় হওয়া নয়। এছাড়া বাইবেল ও কুরআনের বর্ণনার মধ্যে এভাবেও সাজুয্য তৈরী করা যেতে পারে যে, কবীর-এর অর্থ বয়সে বড় নয় বরং মর্যাদায় বড় হিসেবে গ্রহণ করা হোক। 'কালা লান উরসেলাহু মাআকুম' আয়াতে প্রমাণ করেছি যে, হযরত ইয়াকুব ইহুদার উপর যতটা ভরসা করতেন, ততটা রোবানের উপর করতেন না। বিন ইয়ামিনকেও তিনি পাঠিয়েছিলেন ইহুদার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা লাভের পর। কাজেই এক্ষেত্রে ইহুদাই ছিলেন সব থেকে বড়।

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৬)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir